নাচের
পুতুল-৪
রোমেনা আফাজ

দস্যু বনহুর সিরিজ

নাচের পুতুল (৪)-৭৯

রোমেনা আফাজ

সালমা বুক ডিপো

৩৮/২ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

প্রকাশক ঃ
মোঃ মোকসেদ আলী
সালমা বুক ডিপো
৩৮/২ বাংলাবাজার,
ঢাকা-১১০০

প্রচ্ছদ ঃ সুখেন দাস

নতুন সংস্করণ ঃ আগস্ট ১৯৯৮ ইং

পরিবেশনায় ঃ
বাদল ব্রাদার্স
৩৮/২ বাংলাবাজার
ঢাকা-১১০০

কম্পিউটার কম্পোজ ঃ
বিশ্বাস কম্পিউটার্স
৩৮/২-খ, বাংলাবাজার,
ঢাকা-১১০০

মুদ্রণে ঃ
সালমা আর্ট প্রেস
৭১/১ বি. কে. দাস রোড
ফরাশগঞ্জ, ঢাকা-১১০০

দাম ঃ ত্রিশ টাকা মাত্র

উৎসর্গ

আমার প্রাণ প্রিয় স্বামী, যিনি আমার লেখনীর উৎসাহ ও প্রেরণা জুগিয়েছেন আল্লাহ রাব্বিল আলামিনের কাছে তাঁর রুহের মাগফেরাৎ কামনা করছি।

রোমেনা আফাজ
জলেশ্বরী তলা
বগুড়া

সত্য ও ন্যায়ের প্রতীক

দস্যু বনহুর

❑

এই গভীর রাতে কোথায় যাচ্ছো হুর?

কোমরের বেল্টখানা মজবুতভাবে এঁটে পরতে পরতে ঘাড় ফিরিয়ে তাকায় বনহুর—রিলিফ প্রধানকে কিছু পুরস্কার দিয়ে আসি।

পুরস্কার।

হাঁ, পুরস্কারই বটে।

নূরী বললো, তুমি নাকি কাল অনেকগুলো মানুষ হত্যা করেছো?

বিস্ময়ভরা কণ্ঠে বলে বনহুর—মানুষ! মানুষ হত্যা করেছি আমি!

কিছু যেন জানো না তুমি। কাল হাজলা অঞ্চলে এক পোড়োবাড়িতে নাকি রক্তের বন্যা বইয়ে দিয়েছো?

বনহুর নিশ্চুপ হয়ে হাত দু'খানা হাতের মধ্যে রগড়ে নিচ্ছিলো, নূরীর কথাগুলো যেন তার কানেই প্রবেশ করছে না।

বললো নূরী—হাজলার কোনো এক পোড়োবাড়িতে তুমি হত্যালীলা চালাওনি?

এবার বনহুর অট্টহাসিতে ফেটে পড়লো, তারপর হাসি থামিয়ে বললো—হাজলার পশুহত্যার সংবাদ তোমার কানেও পৌঁছেছে দেখছি?

অবাক কণ্ঠে বললো নূরী—পশুহত্যা!

হাঁ, আমি কাল কয়েকটি পশু হত্যা করেছি, কারণ বড় বেয়ারা পশু ছিলো ওরা।

তুমি কি বলছো, তবে যে শুনলাম........

দু'পা বিশিষ্ট পশু কিনা তাই তুমি ঠিকই শুনেছো। জানো নূরী, ঐ পশুগুলো দেশ ও দশের মুখের গ্রাস কেড়ে নিয়ে নিজেরা উদর পূর্ণ করতো, তাই...... ও গুলোকে খতম করে দিয়েছি।

হুর, তোমার রক্তের নেশা আজও মিটলো না? জানি না কবে তুমি এ নেশা থেকে মুক্তি পাবে।

নূরী, এ আমার নেশা নয়, রক্তের তৃষ্ণা বলতে পারো। জানো, দেশের সর্বত্র আজ হাহাকার...ক্ষুধার জ্বালায় মানুষ আজ দিশেহারা উন্মাদ হয়ে উঠেছে। একদিন, দু'দিন, তিনদিন এক সপ্তাহ, দু'সপ্তাহ, তিন সপ্তাহ মানুষ কতদিন ধরে অনাহারে অর্ধাহারে কাটাতে পারে বলো? নূরী, যদি দেখতে অসহায় দুঃস্থ মানুষ আজ বস্ত্রহীন উলঙ্গ অবস্থায় ডাষ্টবীনের পাশে ময়লা আবর্জনা হাতড়াচ্ছে এক টুকরো শুকনো রুটির আশায়—পারতে না, পারতে না নূরী, নিশ্চুপ থাকতে তুমিও পারতে না। এই সুন্দর পৃথিবীর বুকে এক শ্রেণীর মানুষ আবর্জনার মত বেঁচে আছে আর এক শ্রেণীর মানুষ যাদের আমি পশু বা জানোয়ার বলি তারা ঐশ্বর্যের ইমারতে বসে ঐসব দুঃস্থ মানুষের মুখের আহার রাজখাদ্য হিসেবে ব্যবহার করছে। তুমি বুঝবে না কেন আমি ঐ পশুগুলোকে হত্যা করেছি। পশুগুলো এক নম্বর চোরাচালানী........না, ভুল বললাম, যাদের আমি শায়েস্তা করেছি ওরা ছিলো দু'নম্বর—এক নম্বর কারা জানো নূরী?

তা আমি কেমন করে জানবো?

তাঁরা হলেন মহান ব্যক্তি, নাম ধরার কোনো উপায় নেই। যেই নাম উচ্চারণ করেছো—গেছো। কারণ দেয়ালেরও কান আছে। যদি ভুল করে কেউ সেই এক নম্বর মহানেতাদের নাম উচ্চারণ করে বসে তাহলেই হয়েছে। পরদিন তার অস্তিত্ব থাকবে না এ পৃথিবীর বুকে। তাই কার কাঁধে ক'টা মাথা যে সেই স্বনামধন্য ব্যক্তিদের নাম মুখে আনবে। তুমিও না জানাই ভাল।

সত্যি তুমি আমাকে বড্ডা বোকা মনে করেছো। আমি সব জানি—সব বুঝি।

সেই এক নম্বর মহান ব্যক্তিদের টেপা চোখের ইংগিতে দু'নম্বরগুলো কাজ করে। হঠাৎ ধরা পড়ে গেলে দু'দশ দিনের জন্য হাজত কিংবা জেল ভোগ করে, তারপর ফোন পেলেই ছাড়া পায়। হঠাৎ কেউ কেউ গুলী খেয়ে মরে। কিন্তু ঐ মহান ব্যক্তিরা যারা এক নম্বর তাঁরা থাকেন স্বার্গের সুউচ্চ আসনে উপবিষ্ট—সেখানে বসেই তারা অতি কৌশলে কাজ করে যাচ্ছেন, কোনো ব্যাটার সাধ্য নেই তাঁদের নাগাল পায়—কেশাগ্র স্পর্শ করার উপায় নেই কারও। নূরী, পাপ কোনোদিন স্থায়ী নয়, স্বর্গের সোপানে দাঁড়িয়েও

কেউ পাপের প্রায়শ্চিত্ত থেকে রেহাই পাবে না—পায় না কোনোদিন। হাঁ, কি বলছিলে রক্তের নেশায় আমি উম্মত্ত? না না, আমি নই, আমি নই এ পৃথিবীর শুকনো মাটি রক্তের তৃষ্ণায় হাহাকার করছে, ক্ষুধাতুর মানুষের বুকফাটা আর্তনাদ ঝরে পড়ছে শুষ্ক মাটির কণ্ঠ দিয়ে—অন্ন চাই, এক মুঠো অন্ন চাই......

নূরী বনহুরের জামার আস্তিন চেপে ধরে বলে—আজ তোমার কি হয়েছে বলোতো, তোমাকে স্বাভাবিক মনে হচ্ছে না কেন?

হাসলো বনহুর, তারপর তুলে নিলো টেবিল থেকে রিভলভারখানা।

কোথায় যাচ্ছো বললে না তো?

শহরে, মানে রাজধানীতে।

কেন?

এক নম্বর চোরাচালানীকে শায়েস্তা করতে।

জানি না কোনো বিপদ আসবে কিনা।

নূরী, উদ্দেশ্য আমার অসৎ নয়—তুমি নির্ভয়ে থেকো। চলি, খোদা হাফেজ।

এসো। নূরী অস্ফুট কণ্ঠে কথাটা উচ্চারণ করে।

❑

ছোট্ট জানালায় এসে দাঁড়ালো দিপালী। সে শুনতে পেয়েছে একটি পরিচিত পদশব্দ। বিপুল আগ্রহ নিয়ে ছুটে এলো সে জানালার পাশে। জানালা দিয়ে দৃষ্টি নিক্ষেপ করতেই দেখতে পেলো দিপালী তার রাজকুমার জমকালো ড্রেসে পাশের কক্ষে প্রবেশ করলো। অদম্য আশা নিয়ে অপেক্ষা করতে লাগলো দিপালী কখন কক্ষ থেকে বেরুবে তার রাজকুমার। কিছুক্ষণ পরে ঐ কক্ষ থেকে বেরিয়ে গেলো এক ভদ্রলোক, দিপালীর সম্পূর্ণ অপরিচিত। দিপালী কিন্তু তখনও দাঁড়িয়ে আছে কিন্তু কই তার রাজকুমার তো বেরুলো না। পা ধরে এলো, ঘুমে দু'চোখ ঢুলু ঢুলু করছে কিন্তু কোথায় সে!

দিপালী জানালার পাশে হেলান দিযে ঘুমিয়ে পড়লো।

ভদ্রলোক গাড়িতে গিয়ে বসলো।

তখন পূর্বাকাশ ফর্সা হয়ে এসেছে।

গাড়িখানা শহরের পথ ধরে ছুটে চললো। ভোরে রাজপথে তেমন ভিড় নেই তাই গাড়িখানা নিশ্চিন্ত মনে এগিয়ে যাচ্ছে।

দু'একখানা বাড়ি পাশ কেটে চলে যাচ্ছে গাড়িখানার।

পিছন আসনে বসে আছেন, সেই ভদ্রলোক।

ড্রাইভার গাড়ি চালিয়ে চলেছে।

পিছন আসনে ভদ্রলোক বসে সিগারেট পান করে যাচ্ছেন, রাশি রাশি ধোঁয়া ছড়িয়ে পড়ছে গাড়ির মধ্যে।

গাড়িখানা এসে থামলো হিম্‌সা অঞ্চলের কোনো এক গুদামের সম্মুখে। কান্দাইয়ের হিম্‌সা অঞ্চল হলো সবচেয়ে বড় এবং নামকরা ব্যবসায়ী কেন্দ্র। ভদ্রলোক নেমে গেলেন গাড়ি থেকে, একটি কোম্পানীর অফিসে প্রবেশ করতেই দারোয়ান সেলুট করলো।

ভদ্রলোক চেয়ারে বসে রিসিভার তুলে নিলেন হাতে ফোন করলেন কেন্দ্রে রিলিফ প্রধানের কাছে জানালেন, আমি এক্ষুণি আসছি, আপনার সঙ্গে বেরুবো। পাল্টা জবাব এলো—আসুন আমি আপনার অপেক্ষা করছি।

ভদ্রলোক চশমা চোখে ছড়ি হাতে বেরিয়ে এলেন কোম্পানীর অফিসরুম থেকে। গাড়িখানা অফিসরুমের সম্মুখে প্রতীক্ষা করছিলো। ভদ্রলোক এসে গাড়িতে চেপে বসলেন।

গাড়ি বেরিয়ে এলো রাজপথে।

রাজধানীর কেন্দ্রস্থলে স্বনামধন্য ব্যক্তিদের ইমারত। গাড়িখানা মসৃণ জমকালো পিচঢালা পথ ধরে এগিয়ে একটি বিরাট হোয়াইট বিল্ডিংয়ের সম্মুখে এসে থামলো।

গেটের পাশে দারোয়ান দাঁড়িয়ে ছিলো। গাড়িখানাকে দেখতে পেয়ে সোজা হয়ে সেলুট জানালো। ভদ্রলোক হাত বাড়িয়ে দারোয়ানের হাতে একটি কার্ড দিলেন।

নেম কার্ডখানা নিয়ে চলে গেলো দারোয়ান। একটু পরে ফিরে গেটখানা সম্পূর্ণ খুলে দিলো সে। গাড়িখানা গেটের মধ্যে প্রবেশ করলো।

ভদ্রলোক গাড়ি থেকে নেমে দাঁড়াতেই তাঁকে অভ্যর্থনা জানিয়ে ড্রইংরুমে নিয়ে যাওয়া হলো।

সোফায় হেলান দিয়ে সেদিনের সংবাদপত্র পড়ছিলেন রিলিফ প্রধান। সম্মুখে টেবিলে মূল্যবান ট্রের উপরে ধূমায়িত চায়ের কাপ। একটা প্লেটে নানাবিধ ফলমূল। নানা রকম নাস্তাও সাজানো রয়েছে থরে থরে। ভদ্রলোক আসবেন তাই রিলিফ প্রধান সম্মুখে সকালের নাস্তা সহ অপেক্ষা করছিলেন আগন্তুকের।

আগন্তুক এলেন।

রিলিফ প্রধান উঠে দাঁড়িয়ে তাঁকে অভ্যর্থনা জানিয়ে বসালেন।

উভয়ের মধ্যে কিছুক্ষণ গোপন আলাপ চললো। চা-নাস্তা আগন্তুক খেলেন না। কারণ তিনি নাকি কোথাও কিছু খান না। তাই বিশেষ করে রিলিফ প্রধান তাঁকে পীড়াপিড়ি না করে নিজে কিছু গলধঃকরণ করলেন।

কোন গোপন চুক্তি স্বাক্ষরিত হলো উভয়ের মধ্যে। বিদেশ থেকে এবার যে সাহায্যদ্রব্য আসছে তা জাহাজ থেকে খালাসের পূর্বেই হস্তান্তরের এই চুক্তিপত্র সমাধা হলো।

কয়েক কোটি টাকার পণ্যদ্রব্য কাজেই গোপনতার প্রয়োজন আছে বই কি!

এক সময় রিলিফ প্রধান সহ আগন্তুক ভদ্রলোক তাঁর গাড়িতে উঠে বসলেন। হয়তো বা কিছু অর্থ আজই রিলিফ প্রধান গ্রহণ করবেন বলেই তিনি গমন করলেন আগন্তুকের সঙ্গে।

গাড়িতে পাশাপাশি বসে আছেন দু'জন মহৎ ব্যক্তি। এঁরা দেশের স্বনামধন্য লোক। প্রথম তাঁরা গেলেন জাহাজঘাটিতে সেখানে জাহাজ থেকে মাল খালাস অফিসে কিছু আলাপ হলো সেখানের অফিসারের সঙ্গে। তারপর ফিরে চললেন তাঁরা।

রিলিফ প্রধান বললেন—দেখুন জনাব, একদল লোক হয়েছে যারা পরের ভাল দেখতে পারে না। কেউ বড় হোক এ তারা চায় না। আমাদের জাতটাই বড় হিংসুটে।

তা আর বলতে! সেই কারণে আমি আজও বাড়ি ঘর তেমন করিনি মানে ইমারত গড়িনি আর কি। থাকি অত্যন্ত সঙ্কীর্ণভাবে, কোনোরকমে যেন কেউ বুঝতে না পারে আমার অবস্থার কথা। আজ স্বচক্ষে দেখলেই বুঝতে পারবেন।

আজই আপনার ওখানে না গেলেই কি নয়?

এলেন যখন তখন চলুন দেখেই যান আমার অবস্থাটা। যদি কোনদিন প্রয়োজন মনে করেন সোজা চলে আসবেন গরিব খানায়।

কি যে বলেন গরিব আপনি! কোটি কোটি টাকার মালিক হয়ে......

চুপ, জোরে বলবেন না, যদি কেউ শুনে ফেলে তাহলে বুঝতেই পারছেন......আমাদের জাতটা বড় হিংসুটে কিনা, কারো ভাল দেখতে চায় না।

হাঁ, ঠিক বলেছেন জনাব। দেখুন রিলিফদ্রব্য বিভিন্ন কেন্দ্রে বিতরণ করার পূর্বে যৎসামান্য কিছু মাল আমি নিজের জন্য গ্রহণ করি এবং সেই মালামাল আপনাদের মত মহৎ ব্যক্তিদের কাছেই ছেড়ে দেই, এতে আমার যৎসামান্য পয়সা আছে। ও কিছু নয়, কারণ রাজধানীতে তিনটে বাড়ি করছি। জানেন তো এই দুর্দিনে অসাধারণ মূল্যে বাড়ি তৈরির দ্রব্যাদি ক্রয় করতে হচ্ছে। লোহা-চুন-সিমেন্ট সব অগ্নিমূল্য। তারপর দুটো ছেলে বিদেশে পড়াশোনা করছে, মাসে প্রায় পনেরো-বিশ হাজার পাঠাতে হয়। বড় মেয়ের বিয়ে দিয়েছি, গাড়ি-বাড়ি এবং বিশ ভরি সোনার গয়না দিতে হয়েছে। মেজো মেয়ে ডাক্তারী পড়ছে, তার খরচ আছে। বাকি আরও তিনটা ছেলেমেয়ে কলেজে পড়ছে তাদের পড়ার খরচ। এ ছাড়া বুঝতেই পারছেন সংসারের খরচ। ভদ্রভাবে বসবাস করতে গেলে মাসে আট ন' হাজার টাকায় হতে চায় না। স্ত্রীর ইচ্ছে বিলেতে দু'ছেলের জন্য দুটো গাড়ি করে কিন্তু মাস গেলে যা পাই ও কিছু না, তিন চার হাজার মাত্র, ওতে কি সব কিছু গুছিয়ে চলে?

সত্যিই বড় আফসোস, জনসাধারণ আপনার আমার ব্যথা বুঝে না তারা শুধু পাবার জন্য উন্মুখ হয়ে আছে সর্বক্ষণ। রিলিফ দাও না হলে মরে যাবো, তাই না?

হাঁ ঠিক বলেছেন, ওরা মরে যাওয়াই ভাল। যাদের জীবনের কোন দাম নেই, নেই কোনো ভবিষ্যৎ, তারা বেঁচে থেকে কি হবে বলুন? ওসব আবর্জনা পৃথিবীতে না থাকাই ভাল, মরে যাওয়াই শ্রেয় ওদের।

এই তো এসে গেছি। বললেন আগন্তুক ভদ্রলোক।

গাড়ি থামলো একটি চুনবালি খসে পড়া বাড়ির সম্মুখে।

রিলিফ প্রধান মনে মনে নাক সিটকালেও মুখে তিনি ভদ্রতার খাতিরে কিছু বললেন না, কারণ যিনি কোটি কোটি টাকা দেবার জন্য চুক্তিবদ্ধ হয়েছেন তিনি সাধারণ মানুষ নন, এটুকু আঁচ করে নিয়েছেন রিলিফ প্রধান।

গাড়ি থেকে নেমে ভদ্রলোক গাড়ির দরজা খুলে ধরে বললেন—নামুন।

নামলেন রিলিফ প্রধান।

ভদ্রলোককে অনুসরণ করে এগিয়ে চললেন রিলিফ প্রধান।

অপরিচ্ছন্ন একটি গাড়ি। যতই এগুচ্ছেন রিলিফ প্রধান ততই তিনি বিস্মিত হচ্ছেন, এমন বাড়িতে মানুষ থাকে নাকি। উঠান এবং ঘরদোর দেখে কেমন যেন ভূতুড়ে বাড়ি বলে মনে হতে লাগলো তাঁর কাছে।

তিনি উঠানে ইট-পাটকেলের সঙ্গে বারবার হোঁচট খাচ্ছিলেন। কেমন যেন জঙ্গলে ভরা উঠান। কতদিন যে পরিস্কার করা হয়নি তার ঠিক নেই। বললেন তিনি—এখানে আপনি থাকেন?

হাঁ জনাব; দুঃস্থ জনগণকে ফাঁকি দেবার জন্যই তো আমি এই পথ অবলম্বন করেছি। নাহলে একদিন আমার দেহের মাংস ওরা ছিঁড়ে খাবে না?

আপনি দেখছি বড্ড ভীতু। ওদের সাধ্য কি আপনাকে বিরক্ত করে? দেখেছেন তো আমাদের বাড়ি........

বাড়ি বলছেন কেন ইমারত বলুন, বাড়িটা যেন কেমন তুচ্ছ শোনায়। বলুন তারপর?

হাঁ, ঠিক বলেছেন বাড়ি কথাটা সত্যি কেমন যেন শোনায়। বাড়ি বলবে ঐ চাষারা যারা ক'ব জানে না।

বলুন তারপর?

হাঁ, আমাদের ইমারতের চারপাশে সুউচ্চ প্রাচীরের মাথায় কাঁটাতারের বেড়া...

তার উপরে বেশ কলমি লতার মত কি যেন গাছ-গাছড়া দেখেছি বলে মনে হলো না?

ওগুলো কলমি লতা নয়—মানি প্ল্যান্ট।

মানি প্ল্যান্ট! মানি প্ল্যান্ট মানে টাকার গাছ। টাকার আবার গাছ আছে নাকি?

টাকার গাছ নয়, নামটা ঐ রকম।

ও, তাই বলুন—আমি মনে করেছিলাম টাকার গাছ আর টাকার গাছই যখন আপনার কাঁটাতারে শোভা বর্ধন করছে, তবে...মানে গরিবের মুখের খাবার, মানে রিলিফ দ্রব্য এভাবে হরণ করার কি প্রয়োজন ছিলো। তাহলে এগুলো ঠিক টাকার গাছ নয়?

না না, টাকার গাছ নয়, তবে নাম মানি প্ল্যান্ট। হাঁ, কি বলছিলাম যেন?

ও ভুলে গেছেন বুঝি? বলছিলেন ঐ দুঃস্থ নামক ব্যক্তিদের সাধ্য কি আপনাদের গেট পেরিয়ে বিরক্ত করে।

হাঁ হাঁ, ঠিক তাই, গেটের ওপারে পৌঁছবার কোনো উপায় নেই ঐ অসভ্য জানোয়ারদের। গেটে রাইফেলধারী প্রহরী আছে, ওরা গেটের কাছে এগুলেই গলাধাক্কা দিয়ে বিদায় করে দেয়।

হাঁ, আপনি এবং আপনার মত মহৎ ব্যক্তিরা বড় বুদ্ধিমান।

আপনি কিন্তু......

হাঁ, বলুন আমি কিছু মনে করবো না।

আপনি এখনও সেকেলে রয়েছেন, এত টাকা-পয়সার মালিক হয়েও......

এরকম বাড়িতে বাস করি, তাই না?

হাঁ, সত্যি বড় অবাক লাগছে।

আরও অবাক লাগবে ভিতরে আসুন। ভদ্রলোক সম্মুখের একটি কক্ষমধ্যে প্রবেশ করলেন এবং রিলিফ প্রধানকে ভিতরে প্রবেশ করার অনুরোধ জানিয়ে বললেন—এটা আমার হলঘর, মানে বসবার ঘর।

বিস্ময়ভরা কণ্ঠে বললেন রিলিফ প্রধান—এই ঘর আপনার বসবার? চেয়ারগুলো সব হাতলভাঙ্গা রংচটা, কোনোটার পায়া নড়বড় করছে।

আরও অবাক হবেন অন্তপুরে প্রবেশ করলে।

অন্তপুরে! আপনি কি......

না, এখানে আমার স্ত্রীপুত্র নেই, আপনি বিনা দ্বিধায় প্রবেশ করুন।

লোকজন দেখছিনা কেন?

আমার লোকজন নেই।

আপনি একা?

সম্পূর্ণ একা নই, তবে উপস্থিত একাই বটে।

আমাকে তবে কেন এখানে নিয়ে এলেন বলুন তো?

নিভৃতে আলাপ জমবে ভাল তাই......কেন ভয় পাচ্ছেন নাকি?

না না ভয়—ভয় পাবো কেন? আপনি মহৎ ব্যক্তি।

কিন্তু আপনার চেয়ে মহৎ হতে পারলাম কই।

আপনাকে যেন কেমন মনে হচ্ছে।

তাই নাকি?

এ আপনি কোথায় নিয়ে এলেন আমাকে?

বললাম তো আমার বাড়ি।

কিন্তু........

কোনো অসুবিধা হবে না আপনার। আপনি যা ভালবাসেন তাই পাবেন। বলুন তো কি কি আপনি ভালবাসেন?

আপনার কথাগুলো বড় হেঁয়ালিপূর্ণ মনে হচ্ছে।

যা জিজ্ঞাসা করলাম তারই জবাব দিন—কি ভালবাসেন আপনি?

আমি কি ভালবাসি এ প্রশ্ন করছেন কেন, আপনি কি?

হাঁ, আমি তাই দেবো আপনাকে।

সত্যি?

হাঁ, বলুন কি চান আপনি? অর্থ না সোনাদানা?

মাল না পেতেই আমাকে আপনি......

হাঁ, যা চাইবেন তাই দেবো আমি।

আপনার কথা আমার বিশ্বাস হচ্ছে না।

বিশ্বাস না হবার কারণ কি—আমার এই অপরিচ্ছন্ন বাড়িঘর?

না না, তা নয়.........

বলুন থামলেন কেন?

কি বলবো?

ঐ যে ভালবাসেন আপনি সোনাদানা না অর্থ?

সোনাদানাই তো অর্থের মূল, কাজেই সোনা পেলে.........

বেশি খুশি হন, তাই না?

রিলিফ প্রধান কোনো উক্তি উচ্চারণ না করলেও তাঁর মুখোভাব প্রসন্ন মনে হলো কিন্তু কোথায় যেন বাঁধছে, কেমন যেন একটু সন্দেহের ছোঁয়াচ লাগছে তাঁর মনে। ভদ্রলোকের কথাগুলো খুব সচ্ছ মনে হচ্ছে না।

ভদ্রলোক বললেন—চলুন, এবার অন্তঃপুরে চলুন।

রিলিফ প্রধান সন্দিগ্ধ মনে পা বাড়ালেন।

এগিয়ে চললেন ভদ্রলোক, তাঁকে অনুসরণ করলেন রিলিফ প্রধান। অন্তঃপুরে এগুতেই দু'চোখ তাঁর কপালে উঠলো। সম্মুখভাগে অপরিচ্ছন্ন একটি বাড়ি মনে হলেও ভিতরে ঠিক বিপরীত। যদিও ঐশ্বর্যের বালাই বলে কিছু নেই কিন্তু বাড়ির দেয়াল ও মেঝে আর জানালা-কপাট দেখে বিস্মিত হলেন জমকালো আবলুস পাথরে তৈরি রাজপ্রাসাদসম অন্তঃপুর মেঝেতে পা পিছলে যায় আর কি! অদ্ভুত সে বাড়ি, চক্ষুস্থির রিলিফ প্রধানের।

ভদ্রলোকের সঙ্গে এগুতে এগুতে তিনি অবাক হয়ে গেছেন একেবারে। একি আশ্চর্য অদ্ভুত রাজপ্রাসাদ, এ বাড়ির তুলনায় তাঁর বাড়ি খেলনা বলে মনে হচ্ছে যেন।

ভদ্রলোক মাঝে মাঝে রিলিফ প্রধানের মুখে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে দেখছিলেন, মৃদু মৃদু হাসছিলেন তিনি।

বিরাট বিরাট কক্ষ পেরিয়ে এগিয়ে চলেছেন ভদ্রলোক।

রিলিফ প্রধান দু'চোখ গোলাকার করে এগুচ্ছিলেন, এবার তিনি বললেন, এ বাড়ি আপনার?

যদি মনে করেন তবে তাই। হাঁ, এবার বলুন কি চান। একটা কক্ষের দরজা খুলে দিলেন ভদ্রলোক।

সঙ্গে সঙ্গে অস্ফুট শব্দ করে উঠলেন রিলিফ প্রধান—এত সোনা! এত মোহর......

হাঁ, যত খুশি গ্রহণ করুন। যান ভিতরে যান। ভদ্রলোক নিজে দরজায় দাঁড়িয়ে রিলিফ প্রধানকে অনুরোধ জানালেন।

রিলিফ প্রধান স্বপ্ন দেখছেন না সত্য কিছু যেন ভেবে পাচ্ছেন না। তিনি বললেন—ইচ্ছামত নেবো আপনি তা দেবেন কেন?

আপনি যখন ভাগ্যহত দুঃস্থ মানুষের মুখের গ্রাস আমার হাতে সব তুলে দেবেন বলে কথা দিয়েছেন তখন আমিও আপনাকে এই কক্ষের সব সোনাদানা মোহর তুলে দিচ্ছি—গ্রহণ করুন, যান ভিতরে যান।

রিলিফ প্রধান একবার তাকিয়ে দেখলেন ভদ্রলোকের মুখে, তারপর ভিতরে প্রবেশ করলেন কম্পিত পদক্ষেপে। তিনি যেন কিছুতেই নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারছেন না। এত মোহর তিনি দেখেননি কোনোদিন। কক্ষমধ্যে প্রবেশ করে রিলিফ প্রধান দু'হাত ভরে মোহর তুলে নিলেন। হাত দু'খানা তুলে ধরলেন চোখের সামনে।

ঠিক ঐ মুহূর্তে ভদ্রলোক দরজার একপাশে হাত দিলেন, সঙ্গে সঙ্গে লৌহশিকবিশিষ্ট একটি দরজা উঠে এলো মাটির নিচ থেকে। দরজার ওপাশে চমকে উঠলেন রিলিফ প্রধান, বিস্ময় ভরা চোখে দেখলেন তিনি বন্দী হয়ে গেছেন। হাতের মোহরগুলো আপনা আপনি যেন পড়ে গেলো তাঁর হাত থেকে, অবশ্য তিনি ভীষণভাবে ভড়কে গেছেন বলেই হাত দুখানা অবশ হয়ে গেছে। বললেন তিনি—কে আপনি? আমাকে এভাবে বন্দী করলেন কেন?

মুখের দাঁড়ি আর মাথার টুপি খুলে ফেললেন ভদ্রলোক, তারপর দাঁতে দাঁত পিষে বললেন—আপনি বন্দী নন, দস্যু বনহুরের স্বর্ণাগারে আপনি অতিথি।

দস্যু বনহুর! আপনি...তুমি...তুমি দস্যু বনহুর!

হাঁ, সন্দেহের কোনো কারণ নেই। রিলিফ প্রধান, প্রচুর অর্থের প্রয়োজনে আপনি দেশের অগণিত অসহায় মানুষের মুখের গ্রাস আত্মসাৎ

করে নিজের উন্নতি সাধন করেছেন। বিলেতে বাড়ি কিনছেন, বিদেশে ছেলে রেখে লেখাপড়া শেখাচ্ছেন, মেয়ে বিয়ে দিয়েছেন গাড়িবাড়ি যৌতুক দিয়ে, মেয়েকে ডাক্তারী পড়াচ্ছেন, ছেলেমেয়েদের কলেজে পড়াচ্ছেন। ভাই-ভাতিজা, আত্মীয়-স্বজন ওদিকে না খেয়ে মরছে সে খবর রাখা প্রয়োজন মনে করেন না। মনে করেন না দেশের জনগণের কথা—ওরা তো পৃথিবীর বুকে আবর্জনা স্বরূপ, তাই না?

এ সব আপনি, মানে তুমি কি বলছো বাবা? তোমার সব কথা হেঁয়ালিপূর্ণ মনে হচ্ছে......

এখনও না বুঝার ভান করছেন! শুনুন, এই সোনা সব আপনাকে দিলাম কিন্তু এই কক্ষ থেকে আপনি বের হতে পারবেন না। আপনি ইচ্ছামত যত পেটে ধরে সোনাদানা এবং মোহর ভক্ষণ করতে পারেন। আপনি আমার মহামান্য অতিথি, কাজেই আপনার স্থান এই স্বর্ণকক্ষে......বনহুর দরজার পাশে দ্বিতীয় একটি বোতামে চাপ দিলো, সঙ্গে সঙ্গে কক্ষের দরজা বন্ধ হয়ে গেলো।

দরজা বন্ধ হবার মুহূর্তে শোনা গেলো রিলিফ প্রধানের ক্ষীণ আর্তকণ্ঠস্বর—একি হলো আমার ভাগ্যে.........

এরপর আর কিছু শোনা গেলো না। বনহুর সরে গেলো সেখান থেকে।

❑

সর্দার, আব্বাস হাজারীকে আর কতদিন বন্দী করে রাখা হবে? আদেশ করুন এবার তাকে খতম করে দেই?

না রামসিং, এখনও তাকে পৃথিবী থেকে বিদায় দেবার সময় আসেনি, কারণ জম্বুর শয়তানদের সবগুলো সন্ধান এখনও পাইনি। আব্বাস হাজারীর কাছে অনেক কিছু জেনে নেওয়ারও বাকি আছে। শোন রামসিং, যে চিঠিগুলো আব্বাস হাজারীর কাছ থেকে নেওয়ার কথা ছিলো, নিয়েছো?

নিয়েছি সর্দার।

চিঠিগুলো ঠিকভাবে ঠিকানা অনুযায়ী পৌঁছে দিও।

আচ্ছা সর্দার।

ঠিকভাবে চিঠি বিতরণ করো সাবধানে, বুঝলে?

বুঝেছি সর্দার।

যাও।

রামসিং বেরিয়ে যায়।

ঐ মুহূর্তে কক্ষমধ্যে প্রবেশ করে হায়দার আলী। অভিবাদন জানিয়ে বলে—সর্দার, নতুন সুড়ঙ্গপথ তৈরি প্রায় শেষ হয়ে এসেছিলো, কিন্তু...

কিন্তু কি বলো?

সুড়ঙ্গ খননকারী মেশিন বিকল হয়ে গেছে। অচিরে মেশিন চালু না হলে ভূগর্ভ ঘাটির ভীষণ ক্ষতি হবে সর্দার।

বলো কি হায়দার, মেশিন বিকল হয়ে গেছে, এতে সর্বনাশ হবে—জম্বুর ভূগর্ভ দূর্গে আমার প্রায় দেড়শত অনুচর রয়েছে, তারা যে মৃত্যুবরণ করবে।

সর্দার উপায়?

ইঞ্জিনীয়ার কামরুল মেশিন দেখেনি?

সে ভোর থেকে চেষ্টা চালাচ্ছে তবু মেসিন চালু করতে পারছে না। সে ছাড়াও আওরঙ্গ দেখেছে এবং প্রাণপনে মেশিন মেরামত করার প্রচেষ্টা করছে কিন্তু কিছুতেই মেশিন মেরামত হচ্ছে না। মেশিনের কোথায় কি ঘটেছে তাও বুঝতে পারছে না তারা।

বনহুর বললো—চলো দেখি।

হায়দার আলী বনহুরকে অনুসরণ করলো।

এগিয়ে চললো ওরা দু'জন।

প্রশস্ত সুড়ঙ্গপথ।

দু'জন পাশাপাশি এগিয়ে চলেছে। বনহুর বললো—সম্মুখ সুড়ঙ্গপথ এখনও বন্ধ করে দাওনি?

সম্ভব হয়নি সর্দার।

কেন?

নতুন সুড়ঙ্গপথ তৈরি শেষ না হলে......

বুঝেছি কিন্তু বড় বিলম্ব হয়ে গেলো হায়দার আলী। আমি চাই দস্যুরাণী যেন কোনোক্রমে জম্বু আস্তানার পথ খুঁজে না পায়।

সর্দার, আমরা আপনার নির্দেশমতই কাজ করে চলেছি। এক সপ্তাহ অবিরাম প্রচেষ্টা চালিয়ে সুড়ঙ্গপথ বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। আর অপর দিকের গোপন পথ তৈরি হচ্ছে। মেশিন বিকল না হলে আর দু'তিন দিনের মধ্যেই কাজ শেষ হয়ে যেতো...

হাঁ, যত শিগ্‌গির সম্ভব সুড়ঙ্গ পথের কাজ সমাধা করতে হবে। সুড়ঙ্গের মুখ থাকবে জম্বু পর্বতের তলদেশে হিম্‌সা জঙ্গলের দিকে, যে জঙ্গলে কোনোদিন সূর্যের আলো প্রবেশ করেনি।

সর্দার, তাই করা হচ্ছে কিন্তু মেশিন খারাপ হয়ে যাওয়ায় কাজ সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে আছে...

চলো দেখি কি হলো?

যেখানে সুড়ঙ্গ খনন কাজ চলছিলো সেখানে উপস্থিত হয়ে দেখলো বনহুর, কয়েকজন অনুচর এবং দু'জন দক্ষ ইঞ্জিনীয়ার মেশিনটা কার্যক্ষম করে তোলার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

বনহুর এসে দাঁড়াতেই ওরা তাকে অভিবাদন জানালো।

বনহুর প্রধান ইঞ্জিনীয়ারকে জিজ্ঞাসা করলো—মেশিন মেরামত হলো?

না সর্দার। অনেক চেষ্টা করেও ধরতে পারছি না কোথায় কি হয়েছে।

ইঞ্জিনীয়ারগণ বনহুরেরই দলের লোক। তারা এক এক জন বিদেশ থেকে ইঞ্জিনীয়ারিং ডিগ্রি নিয়ে এসেছে। বনহুর তাদের সরে দাঁড়াতে বলে নিজে মেশিন পরীক্ষা করে দেখতে লাগলো। নিজেও সে কিছু কিছু এ সব কাজ জানতো, তাই সে চেষ্টা করে দেখতে লাগলো।

সুড়ঙ্গ খনন মেশিনটা ছিলো অত্যন্ত মূল্যবান এবং শক্তিশালী, ক্ষমতা সম্পন্ন—পৃথিবীর মধ্যে এমন মেশিন কয়েকটিমাত্র আছে, যা দিয়ে শত শত ফুট মাটির নিচে গভীর সুড়ঙ্গপথ তৈরি করা সম্ভব হয়, এমনকি সাগরতলেও এ মেশিন দ্বারা রেলপথ বা সুড়ঙ্গ পথ তৈরি করা হয়ে থাকে।

দস্যু বনহুরের নিজস্ব ছিলো এই ক্ষমতাসম্পন্ন মেশিনটা এবং এটা বহুদিন পূর্ব হতেই আছে। বনহুর নিজে মাঝে মাঝে এ মেশিন চালনা করে থাকে, অবশ্য যখন কোনো সুড়ঙ্গপথের দ্রুত প্রয়োজন হয়। কাজেই বনহুর মেশিন চালনায় যখন দক্ষ তখন নিশ্চয়ই মেশিন মেরামতেও তার কিছু কিছু অভিজ্ঞতা আছে। বনহুর নিজে মেশিনটা পরীক্ষা করে দেখতে শুরু করলো। হঠাৎ চমকে উঠলো বনহুর, মেশিনের ভিতরে একটি গুরুত্বপুর্ণ অংশ নেই, যার জন্য এত বড় শক্তিশালী যন্ত্রদানবটা একেবারে নিশ্চল হয়ে গেছে প্রাণহীন কোনো এক বিরাটকায় জন্তুর মৃত দেহের মত। হঠাৎ বনহুরের একটি জিনিসে লক্ষ্য পড়তেই এমনভাবে চমকে উঠেছিলো, সে জিনিষটা হলো বিকল যন্ত্রটির পাশে সূতো দিয়ে বাঁধা একটি ছোট চিঠি।

বনহুর চিঠিখানা খুলে নিলো সুতোর গিরো থেকে। আশ্চর্য হলো বনহুর, এই শক্তিশালী বিরাটকায় মেশিনের মধ্যে এ চিঠি এলো কি করে। দ্রুতহস্তে খুলে ফেললো বনহুর ছোট চিঠির ভাঁজখানা। মুহূর্তে তার মুখমণ্ডলে গভীর একটা ভাব পরিস্ফুটিত হলো, চিঠিখানা যেন তার সমস্ত দেহের রক্ত জমাট করে দিয়েছে, চিঠিতে লেখা আছে—

আমার চোখে ধুলো দেবার জন্য
তুমি সুড়ঙ্গমুখ বন্ধ করেছো
এবং নতুন সুড়ঙ্গপথ তৈরি
করছো—কিন্তু মনে রেখো বনহুর,
আমাকে ধোঁকা দিতে পারবে না।

—দস্যুরাণী

—দস্যুরাণী! দস্যুরাণী কি করে এলো এখানে? হায়দার আলী চিঠিখানা পড়ে দেখো।

চিঠিখানা বনহুর হায়দার আলীর হাতে দিলো। হায়দার আলীর মুখমণ্ডলে বিস্মিত ভাব ফুটে উঠেছে, দস্যুরাণী...অস্ফুট শব্দ করে উঠে সে।

বনহুরের মুখে প্রথমে একটা বিস্ময় এবং ক্রুদ্ধ ভাব পরিলক্ষিত হলেও অল্পক্ষণেই তা প্রশমিত হলো, বললো সে—এবার বুঝতে পারছি মেশিন

হঠাৎ এমন অকেজো হলো কি করে? হায়দার আলী, তোমাদের চোখে ধুলো দিয়ে এই নতুন সুড়ঙ্গপথেও দস্যুরাণী জম্বু আস্তানায় প্রবেশ করেছিলো তবে।

হায়দার আলীর মুখমণ্ডল লজ্জিত ও ভয়ার্ত হয়ে উঠে, ললাটে ফুটে উঠে কয়েকটা চিন্তারেখা দড়ির মত শক্ত হয়ে, একবার সর্দারের মুখে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে মাথা নত করে নেয় সে।

বলে বনহুর—আমি জানতাম তোমরাও এমনি ভুল কোনো সময় করবে। প্রধান ইঞ্জিনীয়ার আওরঙ্গ এবং তাঁর সহকারী ইঞ্জিনীয়ার কামরুলকে লক্ষ্য করে বললো—নিশ্চয়ই এমন কোনো ব্যক্তি এসেছিলো এখানে যে মেশিনটাকে অকেজো করে দিয়ে গেছে এবং সেই ব্যক্তি স্বয়ং দস্যুরাণী। হায়দার, কেউ এসেছিলো এখানে?

না সর্দার, কেউ তো আসেনি, শুধু আমাদেরই লোকজন ছিলো এখানে।

কে কে ছিলো নাম বলো।

রফিক নামক অনুচর লিষ্ট নিয়ে এলো এবং লিষ্ট দেখে নামগুলো উচ্চারণ করে বললো। সবাই তো জম্বু আস্তানার অনুচর, কেউ নতুন বা বাইরের লোক ছিলো না।

আওরঙ্গ এবং কামরুল দু'জনই অভিজ্ঞ ইঞ্জিনিয়ার—এরা বিদেশ থেকে শিক্ষা লাভ করে এসেছে অথচ তবু তারা ধরতে পারেনি মেশিনে কি গোলযোগ দেখা দিয়েছে। বনহুর বললো—দস্যুরাণী মেশিনের মূল্য যন্ত্র বিকল করে দিয়েছে, যন্ত্রটি অত্যন্ত ক্ষুদ্র হলেও মেশিনটি চালু রাখার একমাত্র সহায়ক। সেই ক্ষুদ্র যন্ত্রটি শুধু অকেজোই সে করে দেয়নি, যন্ত্রটি সে খুলে নিয়েছে......

বলে উঠে হায়দার আলী—আশ্চর্য কথা সর্দার, কারণ সব সময় এখানে আমাদের লোক ছিলো। দস্যুরাণী কখন কিভাবে এখানে প্রবেশ করেছিলো একেবারে বিস্ময়কর সর্দার।

তোমরা কি জানো না পৃথিবীতে বিস্ময়কর কিছু নেই। যাদুকরগণ কিভাবে শত শত দর্শকের চোখে ভেল্কি লাগিয়ে যাদুবিদ্যার কারসাজি

দেখিয়ে মানুষকে তাক লাগিয়ে দেয়—তেমনি দস্যুরাণী তোমাদের চোখেও ভেল্কি লাগিয়ে এ কাজ সমাধা করেছে। মেশিন বিকল হবার পূর্ব মুহূর্তে কে ছিলো মেশিনে?

হারুন নামক অনুচর বললো—ইঞ্জিনীয়ার কামরুল ছিলো তখন এবং অন্যান্য আরও কয়েকজন ছিলো, তারা মেশিনে ছিলো না।

বনহুর ফিরে তাকালো ইঞ্জিনীয়ার কামরুলের দিকে, তারপর ধীরে ধীরে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিলো মেশিনটার দিকে। কামরুল তখন মেশিনটার একপাশেই দাঁড়িয়ে ছিলো। বনহুর মেশিনটার দিকে লক্ষ্য করে পুনরায় ফিরে তাকালো কামরুলের মুখে, তারপর সে অনুচরদের বেরিয়ে যাবার জন্য নির্দেশ দিলো।

আদশে পালন করলো অনুচবগণ।

সবাই বেরিয়ে যেতেই বনহুর দ্রুতহস্তে রিভলবার বের করে চেপে ধরলো কামরুলের বুকে—রাণীজী তুমি! ভেবেছিলে আমার চোখে ধুলো দিয়ে সরে পড়বে কিন্তু মনে রেখো এই তোমার শেষ আমার আস্তানায় প্রবেশ।

পুরুষবেশী দস্যুরাণী মুহূর্তের জন্য কিংকর্তব্যবিমূঢ় হলেও নিজকে সামলে নিলো সে অল্পক্ষণেই। দীপ্ত দৃঢ়কণ্ঠে বললো কামরুলবেশী দস্যুরাণী—বনহুর, তুমি আমাকে চিনতে পারবে এ আমি জানতাম কিন্তু আমি জানি আমাকে তুমি বন্দী করতে পারবে না।

তাই নাকি?

হাঁ বনহুর এবং জানি তুমি আমাকে বন্দী করে রাখতে পারবে না আর পারবে না বলেই আমি তোমার আস্তানায় প্রবেশ...

দস্যুরাণীর মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বলে বনহুর—আমার আস্তানায় প্রবেশের দুঃসাহস করেছো। হঠাৎ বনহুর হেসে উঠলো, তারপর দাঁতে দাঁত পিষে বললো—রাণীজী, তোমার সাধ্য নেই তুমি আমার আস্তানা থেকে বেরিয়ে যাও। আমি তোমাকে এই মুহূর্তে বন্দী করলাম।

দস্যুরাণীর বুকে বনহুরের রিভলবারের আগা তখনও ঠেকে আছে। দস্যুরাণী তাকালো বনহুরের চোখ দুটোর দিকে। দীপ্ত উজ্জ্বল নীল দুটি চোখ, বলিষ্ঠ মুখমণ্ডল, একরাশ ঘন চুল ছড়িয়ে ওর ললাটে।

হেসে বললো বনহুর—কি দেখছো?

তোমাকে।

আমাকে?

হঁ্যা।

কিন্তু কেন?

তোমার ঐ সুন্দর রূপ দিয়ে তুমি নারীদের মন জয় করে নাও এবং করো তাদের সর্বনাশ......

এসব তুমি কি বলছো রাণীজী?

যা সত্যি তাই বলছি কিন্তু মনে রেখো বনহুর, আর তুমি পারবে না তোমার সৌন্দর্য দিয়ে নারীমনকে জয় করতে।

রাণীজী, এ তোমার সম্পূর্ণ ভুল ধারণা।

না, আমি জানি তুমি......

খবরদার, কোনো অশ্লীল বাক্য উচ্চারণ করবে না রাণী......

তাহলে আমাকে তুমি কেন বন্দী করতে চাও? যদি আমার প্রতি তোমার কোনো দুর্বলতা না-ই থাকে তবে আমাকে...

মুক্তি দেবো, এই তো?

দস্যুরাণী কোনো কথা উচ্চারণ করে না।

বনহুর বলে উঠে—রাণীজী, তুমি নিজে এসে ধরা দিলে, এ আমার সৌভাগ্য। বনহুর কলিং বেলে হাত রাখতে যাচ্ছিলো, ঐ সময় দস্যুরাণী বলে উঠে—বনহুর, জানি তুমি তোমার অনুচরদের আহ্বান জানানোর জন্য ঐ কলিংবেল টিপতে যাচ্ছিলে। ওরা এলে আমাকে বন্দী করে কৃতিত্ব লাভ করবে? বনহুর, জানি তুমি একজন বিশ্ববিখ্যাত দস্যু হলেও তুমি একজন মহৎপ্রাণ মানুষ......

এ কথা তুমি স্বীকার করো তাহলে?

যা সত্য না করে উপায় নেই। বনহুর, তোমার এবং আমার উদ্দেশ্য এক, তাই একটি কথা বলবো বলেই এসেছি এবং তোমাকে নিভৃতে কাছে পাবো বলে আমি তোমার সুড়ঙ্গ খনন মেশিনটা বিকল করেছি।

দু'চোখে বিস্ময় নিয়ে তাকিয়ে থাকে বনহুর দস্যুরাণীর মুখের দিকে।

দস্যুরাণী বলে চলে—জম্বু আস্তানার সুড়ঙ্গমুখ বন্ধ করে দিচ্ছো যেন আমি তোমার আস্তানার পথ খুঁজে না পাই। বনহুর, যেমন তোমার চোখকে ফাঁকি দেওয়া আমার পক্ষে সম্ভব হলো না, তেমনি আমার দৃষ্টিকেও তুমি এড়িয়ে চলতে পারবে না। সুড়ঙ্গপথ তুমি বন্ধ করো কিন্তু আমার গতিরোধ করতে তুমি সক্ষম হবে না।

তার প্রমাণ পেলাম, তুমি সত্যিই দস্যুরাণী বটে! বলো তুমি কি চাও আমার কাছে?

যে রক্তে আঁকা ম্যাপের জন্য তুমি আমার পিছু ধাওয়া করেছো আমি তোমাকে অনুরোধ করছি তুমি ঐ ম্যাপ সম্বন্ধে সবকিছু ভুলে যাও।

ও এই কথা!

হাঁ, বনহুর, আমাদের উভয়ের উদ্দেশ্যই যখন এক তখন তুমি আমাকে এ ব্যাপারে সহায়তা করবে বলেই আশা করি, আর তেমনই এক মহান ভরসা নিয়েই আজ আমি এসেছি। বনহুর, আশা করি তুমি আমাকে বিমুখ করবে না।

দস্যুরাণীর কথাগুলো বনহুর মনোযোগ সহকারে শুনে যাচ্ছিলো। স্থির দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে ছিলো সে ওর মুখের দিকে। দস্যুরাণীর ছদ্মবেশ অতি নিখুঁত হয়েছিলো, সাধ্য নেই কেউ তাকে নারী বলে বুঝতে পারে। বনহুর অবাক না হয়ে পারেনি, তাই সে নির্বাক হয়ে গিয়েছিলো কতকটা।

দস্যুরাণী তবু বলে চলেছে—আমি শপথ করছি, তুমি আমার রক্তে আঁকা ম্যাপ থেকে বিরত হও আমি কোনোদিনই তোমার চলার পথে এসে দাঁড়াবো না।

বেশ, তাই হবে। বিশেষ করে আমাদের উদ্দেশ্য যখন এক তখন আমি তোমার সঙ্গে সন্ধি করতে রাজি আছি. কিন্তু একটি কথা রাখতে হবে তোমাকে...

বলো বনহুর।

মন্থনার আস্তানা তোমাকে সরিয়ে নিতে হবে। জানি এতে তোমার ক্ষতি হবে অনেক—শুধু অনেক নয় সীমাহীন, তবু এ কাজ তোমাকে করতে হবে।

বনহুর!

হাঁ রাণীজী, কারণ তুমি জানতে চেও না। চাইলেও আমি তা বলবো না।

কিন্তু......

জানি মন্থনায় তোমার অনেক দান আছে। মন্থনার হাসপাতাল সে তোমারই তৈরি। মন্থনা থেকে মান্‌হা পর্বতের মধ্যে যে সুপ্রশস্ত সুদীর্ঘ পথ সেও তোমারই দান, তবু তোমাকে মন্থনা ত্যাগ করতে হবে দস্যুরাণী।

বেশ, তবু যদি তুমি আমার রক্তে আঁকা ম্যাপ থেকে সরে আসো।

হাঁ, আমি রক্তে আঁকা ম্যাপ থেকে নিজেকে সংযত করলাম। দস্যুরাণীর দিকে হাত বাড়িয়ে দিলো—এসো এবার সন্ধি...

দস্যুরাণীও হাত বাড়িয়ে দিলো বনহুরের দিকে।

বনহুরের বলিষ্ঠ হাতের মুঠায় দস্যুরাণীর হাতখানা মিলিত হলো।

বনহুর বললো পুনরায়—চলো রাণীজী, তোমাকে আস্তানার বাইরে পৌঁছে দিয়ে আসি।

একটু অপেক্ষা করো বনহুর তোমার সুড়ঙ্গপথ খনন মেশিনটা মেরামত করে দিই।

ও তোমাকে করতে হবে না রাণীজী। তুমি যে ক্ষুদ্র অংশ খুলে নিয়ে ওটাকে বিকল করেছিলে শুধু ওটা ফিরিয়ে দাও।

দস্যুরাণী পকেট থেকে ক্ষুদ্র একটা মেশিন বল বের করে বনহুরের হাতে দিলো, তারপর ওরা দু'জনা এগিয়ে চললো পাশাপাশি।

❑

সর্দার!

বলো হায়দার আলী?

দস্যুরাণীকে আপনি হাতে পেয়েও ছেড়ে দিয়েছেন, এ কেমন কথা। আরও শুনলাম সেই নাকি ইঞ্জিনীয়ার কামরুলের বেশে.........

এত কথা কে তোমাকে বললো হায়দার আলী?

সর্দার সব আমি শুনেছি।

বুঝেছি, রহমান তোমাকে বলেছে।

হাঁ সর্দার। বলুন কেন আপনি তাকে এমনভাবে ক্ষমা করলেন?

ক্ষমা নয় হায়দার আলী সন্ধি, বুঝলে......

দস্যুরাণীর সঙ্গে সন্ধি!

বেমানান মনে হচ্ছে, না?

সর্দার!

জানি দস্যুরাণীকে বন্দী করার জন্য আমি উন্মুখ, সেও তেমনি আমাকে বাগে পেলে কমে ছাড়বে না তবু কেন সন্ধি করলাম জানতে চাও?

হাঁ সর্দার।

তোমরা সবাই জানো দস্যুরাণী এবং আমার উদ্দেশ্য এক, কাজেই আমি চাইনা আমাদের উভয়ের মধ্যে কোনো বিবাদ থাকে। অনেক ভেবে দেখলাম রক্তে আঁকা ম্যাপ তার কাছে থাকাই শ্রেয় কারণ সেও ঐ ধনসম্পদ দুঃস্থ জনসেবায় বিলিয়ে দেবে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। তবে একটি শর্ত আমি তাকে পালন করতে বলেছি সে হলো মন্থনা দ্বীপ তাকে ত্যাগ করতে। কারণ তাকে না বললেও তোমাকে বলতে চাই এবং এক্ষুণি বলবো।

সর্দার একটি কথা তার পূর্বে আমি বলতে চাই।

বেশ বলো?

দস্যুরাণী আমাদের দ্বিতীয় সুড়ঙ্গপথ কি করে আবিষ্কার করেছিলো?

হাঁ, এ কারণেই আমি তাকে হত্যা না করে তার সঙ্গে সন্ধি স্থাপন করেছি জেনেছি সে আমার চেয়ে বুদ্ধিমত্তায় দুর্বল নয় এবং এ কারণেই আমি তাকে মন্থনা ছেড়ে চলে যাবার জন্য বলেছি। সে যদি মন্থনা ত্যাগ না করে তাহলে আমি তার সঙ্গে কোনো সন্ধি রাখতে রাজি নই। অবশ্য বিনা কারণে তাকে এ নির্দেশ দেই নি হায়দার আলী।

জানি সর্দার, আপনি বিনা কারণে এমন কোনো কাজ করেন না আমরা জানি। সর্দার তবু জানতে চাই দস্যুরাণী মন্থনা ত্যাগ না করলে ......

আমাদের এমন কি ক্ষতি ছিলো তাই না?

হাঁ সর্দার।

হায়দার আলী, তুমি যখন জানতে চাইছো তখন না বলে পারছি না। দস্যুরাণী আমার চেয়ে বুদ্ধিমত্তায় কম নয়। পূর্বেই বলেছি শক্তিতে ঠিক আমার সমকক্ষ না হলেও যথেষ্ঠ শক্তি তার আছে, কাজেই আমি চাই না আমার অবর্তমানে দস্যুরাণী আমার জম্বুর আস্তানায় প্রবেশ করে এবং তোমাদের কোনো ক্ষতি সাধন করতে সমর্থ হয়। জানি সে যখন প্রথম বার আবার আস্তানা খুঁজে বের করে নিয়েছে তখন দ্বিতীয় কিংবা তৃতীয় বার আস্তানার সুড়ঙ্গপথ খুঁজে নিতে তার বেশি বিলম্ব হবে না। একটু থেমে বললো বনহুর—এ ছাড়া মন্থনা তার রাজ্য নয় যদিও সে মন্থনার অনেক কাজ করেছে। মন্থনা আমার জম্বু আস্তানার এক অংশ।

তাহলে দস্যুরাণী কি মন্থনার আস্তানা গুটিয়ে নিয়ে বিদায় নেবে সর্দার?

না নিলেও আমি তাকে চলে যেতে বাধ্য করছি। সে যদি মন্থনা ত্যাগ না করে তা হলে তার পরম যত্নের সম্পদ রক্তে আঁকা ম্যাপ সে হারাবে।

এমন সময় রামসিং এসে সালাম জানালো।

বনহুর বললো—চিঠিগুলো ঠিকমত পৌছে দিতে সক্ষম হয়েছো তো?

হাঁ সর্দার, হয়েছি।

বেশ, এবার আমি কাজ শুরু করবো। রহমান কোথায়?

সেও ফিরে এসেছে।

আচ্ছা তুমি এখন যাও।

হায়দার আলী বলে উঠে—সর্দার আমিও কি এখন যেতে পারি?

যাও তোমরা সবাই প্রস্তুত থেকো।

আচ্ছা সর্দার। কথাটা উচ্চারণ করে বেরিয়ে গেলো হায়দার আলী এবং রামসিং।

বনহুর আপন মনে পায়চারী করে চললো। বনহুরের শরীরে জমকালো পোশাক মশালের লাল টক্‌টকে আলোতে অদ্ভুত দেখাচ্ছে। ওর প্রশস্ত ললাটে গভীর চিন্তার ছাপ ফুটে উঠেছে।

প্যান্টের পকেট থেকে বের করলো সিগারেট কেসটা। একটা সিগারেট নিয়ে ঠোঁটের ফাঁকে চেপে ধরে অগ্নিসংযোগ করলো, তারপর রাশিকৃত ধোঁয়ার মাঝে তলিয়ে গেলো সে।

/

❑

হাজারী সাহেবের অন্তর্ধান নিয়ে জম্বুর নেতৃস্থানীয় শ্রেণীর মানুষ একেবারে হন্যে হয়ে উঠলেন। অকস্মাৎ হাওয়ায় উবে যাওয়ার মত যেন উবে গেছেন তিনি।

হঠাৎ কোথায় উধাও হলেন তিনি, কেউ জানেন না। হাজারী সাহেবই যে তাঁদের পথের দিশারী। তার অন্তর্ধান সবাইকে ভাবিয়ে তুললো।

পুলিশ মহলকে এইসব মহান নেতা নাচিয়ে তুললেন।

টেলিফোন এলো কোনো এক নেতার কাছ থেকে জম্বু পুলিশ প্রধানের কাছে—আপনারা যদি মিঃ হাজারী সাহেবকে খুঁজে বের করতে অক্ষম হন তাহলে আপনাদের প্রতি কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

পুলিশ প্রধানের পিলে চমকে গেলো। তিনি ফোন করলেন জম্বুর অন্যান্য পুলিশ অধিনায়কের কাছে। তারা তো ক'দিন থেকে হাজারী সাহেবের তল্লাশে জম্বু শহর এবং আশেপাশের গ্রামাঞ্চল চষে ফেলেছেন কিন্তু হাজারীর কোনো হদিস খুঁজে পাওয়া যায় নাই, হাজারী সম্পূর্ণ লাপাত্তা।

যে সব মহান ব্যক্তি হাজারী টিমের সঙ্গে জড়িত তাঁরা যেন দিশে হারা হয়ে পড়েছেন। কারণ হাজারীর নিরুদ্দেশ তাঁদের ব্যবসার সর্বনাশ ছাড়া কিছু নয়।

হাজারীকে নিয়ে যখন হাজারীটিমের মাথা বন বনিয়ে চক্র দিচ্ছে তখন তাঁদের হাতে এলো একখানা চিঠি।

চিঠি খুলে সবাই অবাক হলেন এ যে তাদের পথের দিশারী হাজারী সাহেবের হাতের লেখা। চিঠি খুলে পড়ে দু'চোখ তাদের চড়ক গাছ। চিঠিগুলোতে লিখা ছিলো—-

বন্ধুগণ এতোদিন যে কাজ করেছি
এবার তার প্রায়শ্চিত্ত করছি। নিজে-
দের স্বার্থে অন্ধ হয়ে দুঃস্থ জনগণের
মুখের গ্রাস নিয়ে ছিনিমিনি
খেলেছি। শুধু আমি নই, আমাদের
হাজারী টিমের সবাইকে প্রায়শ্চিত্ত
করতে হবে। বন্ধুগণ, প্রস্তুত
হয়ে নিন, বিচার সন্নিকটে......
'পথের দিশারী হাজারী'

চিঠিতে কোনো ঠিকানা নেই। হাজারী সাহেব কোথায় আছেন এবং কি প্রায়শ্চিত্ত তিনি করছেন কিছুই বুঝা যায় না তাঁর চিঠিতে, তবে এটুকু সবাই বুঝতে পারেন হাজারী সাহেব জীবিত আছেন এবং অত্যন্ত দুর্বিসহ অবস্থায় তাঁকে রাখা হয়েছে।

হাজারী সাহেবের চিঠি পেয়ে হাজারী টিমের প্রধান অধিনায়ক ভিতরে ভিতরে ঘাবড়ে গেলেও মুখে যথাসম্ভব সাহস টেনে বললেন—কার এতবড় সাহস হাজারী সাহেবকে বন্দী করেছে...আমরাই হলাম কিনা জম্বুর হর্তা-কর্তা-বিধাতা, আমাদের কথায় পুলিশ মহল নাচের পুতুলের কাজ করে, আর কিনা দুষ্কৃতিকারী আমাদের পথপ্রদর্শক হাজারী সাহেবকে আটক করে তাঁকে নাকানি চুবানি খাওয়াচ্ছে। আবার হাজারী সাহেবকে দিয়ে চিঠি লিখিয়ে আমাদের সবাইকে ভয় দেখানো হচ্ছে।

হাজারী টিমের অধিনায়কের কথা শেষ হয় না, দ্বিতীয় অধিনায়ক এসে হাজির হন। তাঁর চোখেমুখেও উত্তেজনার ছাপ। এক রকম প্রায় উঠিপড়ি করে এসেছেন দ্বিতীয় অধিনায়ক, তাই তিনি বেশ হাঁপিয়ে পড়েছেন।

প্রধান অধিনায়ক পায়চারী করছিলেন আর কথাগুলো আপন মনেই বলে যাচ্ছিলেন, এবার তিনি থমকে দাঁড়িয়ে বললেন—আপনি!

হাঁ এলাম, চিঠি...একটি চিঠি পেয়েছি। রীতিমত হাঁপাতে হাঁপাতে বললেন দ্বিতীয় অধিনায়ক।

প্রথম অধিনায়কের হাতের মুঠায় তখনও ছিলো সেই চিঠিখানা, তিনি বললেন—চিঠি।

হাঁ, হাজারী সাহেবের চিঠি পেয়েছি। যে হাজারী সাহেবের সন্ধানে আমরা মানে আমাদের লোক গোটা জম্বু চষে ফিরলো হঠাৎ তাঁরই লিখা চিঠি পেলাম এই দেখুন...পেকেট থেকে বের করলেন একটি ভাঁজ করা কাগজ।

এবার প্রধান অধিনায়ক বললেন—আমিও একটু পূর্বে হাজারী সাহেবের লেখা একটি চিঠি পেয়েছি। দেখি আপনার চিঠিতে কি লিখা আছে? প্রধান অধিনায়ক দ্বিতীয় অধিনায়কের হাত থেকে চিঠিখানা নিয়ে এক নিঃশ্বাসে পড়লেন। চিঠিখানা পড়ে নিয়ে বললেন—এই দেখুন একইভাবে লিখা আমাকেও তিনি পাঠিয়েছেন।

তারা যখন দু'খানা চিঠি নিয়ে আলোচনা করছেন তখন টেবিলে ফোন বেজে উঠলো ক্রিং ক্রিং করে।

রিসিভার তুলে নেন প্রধান অধিনায়ক। ...হ্যালো স্পিকিং হাজারী টিম অধিনায়ক......

ওপাশ থেকে শোনা গেলো উত্তেজনাপূর্ণ কণ্ঠস্বর...হাজারী সাহেবের চিঠি পেয়েছি....

...হাজারী সাহেবের চিঠি।......

...হাঁ এইমাত্র পেলাম......

...কি লিখা আছে তাতে?......

...আমি পড়ছি আপনি শুনুন.....

...বেশ পড়ুন......

ওপাশ থেকে ভেসে এলো চিঠি পড়ছেন হাজারী টিমের তৃতীয় অধিনায়ক। চিঠি পড়া শেষ হলো।

প্রধান অধিনায়ক অস্ফুট কণ্ঠে বললেন...হ্যালো...আমিও একটু পূর্বে ঠিক ঐ ধরনের একটি চিঠি পেয়েছি এবং আমাদের আরও একজন পার্টনারও ঐ রকম চিঠি পেয়েছেন...আপনিও পেয়েছেন...সব যেন কেমন ঘোরালো লাগছে...আপনি এক্ষুণি চলে আসুন......

রিসিভার না রাখতেই বাইরে গাড়ির শব্দ শোনা গেলো। তারপর সিঁড়িতে জুতোর আওয়াজ, একটু পরেই কক্ষমধ্যে প্রবেশ করলেন হাজারী টিমের চতুর্থ অধিনায়ক।

সমস্ত দেহ তাঁর ঘামে ভিজে চুপসে উঠেছে। তিনি কিছুক্ষণ কথাই বলতে পারলেন না।

হাজারী টিমের প্রধান অধিনায়ক তাকে বসতে অনুরোধ জানালেন।

চতুর্থ অধিনায়ক আসন গ্রহণ করে রুমালে মুখ মুছলেন তারপর বললেন—বসুন কথা আছে।

হাজারী টিমের প্রধান অধিনায়ক আসন গ্রহণ করতে করতে বললেন সব বুঝতে পেরেছি, আপনিও চিঠি পেয়েছেন।

হাঁ চিঠি, কিন্তু আপনি কি করে বুঝতে পারলেন স্যার?

আমিও পেয়েছি শুধু আমি নই আমাদের আরও কয়েকজন অংশীদার তারাও পেয়েছেন......

বলেন কি স্যার?

হাঁ, এই যে ইনিও পেয়েছেন......হাজারী টিমের প্রধান অধিনায়ক দ্বিতীয় অধিনায়ককে দেখিয়ে বললেন এবং নিজ নিজ হাতের চিঠিগুলো দেখালেন।

চতুর্থ অধিনায়ক যেন হতভম্ব হয়ে পড়েছেন। তিনি এক এক করে তিনখানা চিঠিই পড়লেন। সবগুলোতে একই কথা লিখা আছে এবং তাঁরা সবাই হাজারী সাহেবের হাতের লেখাই দেখতে পাচ্ছেন।

একটু পূর্বে হাজারী টিমের তৃতীয় অধিনায়ক যিনি টেলিফোনে কথা বলেছিলেন তিনি সশরীরে এসে হাজির হলেন। আরও তিনজন অধিনায়ক এলেন কয়েক ঘন্টার মধ্যে। সবারই গাড়ি রয়েছে কাজেই জম্বুর মধ্যে যত দূরেই থাকুন না কেন তাদের প্রধান অধিনায়কের নিকটে হাজির হতে বেশি সময় লাগলো না।

সবাই জোট হলেন এসে।

হাজারী টিমের প্রধান অধিনায়ক তাঁর জৌলুসভরা হলঘরের কার্পেটে পায়চারী করছিলেন। চারপাশে সোফায় বসে আছেন হাজারী টিমের

অধিনায়কগণ। সবার চোখেমুখেই উত্তেজনার ছাপ ফুটে উঠেছে। কেউ বা সিগারেটের পর সিগারেট পান করে চলেছেন, কেউবা বারবার রুমালে মুখ মুছছেন, কেউ বা মাথার চুল ধরে টেনে ছিঁড়ে ফেলার উপক্রম করছেন।

হাজারী সাহেবকে আটক রেখে তারই দ্বারা চিঠি লিখিয়ে হাজারী টিমকে শাসন করা হয়েছে। কিন্তু কে সেই ব্যক্তি যার এত দুঃসাহস হাজারী টিমের সঙ্গে চক্র খেলছে। সে জানে না কারা তাঁরা যারা হাজারী টিমের অধিনায়ক। জানলে কিছুতেই এমন দুঃসাহস তার হতো না। পায়চারী বন্ধ করে এক নিঃশ্বাসে কথাগুলো বললেন প্রধান অধিনায়ক।

দ্বিতীয় অধিনায়ক বললেন—নিশ্চয়ই কোনো যড়যন্ত্রকারী আমাদের পিছু লেগেছে।

তৃতীয় অধিনায়ক বললেন—পিছু লেগেছে না, হাজারী টিমকে ধ্বংস করে দেবার চক্রান্ত করছে।

চতুর্থ অধিনায়ক বললেন—এই ষড়যন্ত্রকারী শুধু হাজারী টিমকে ধ্বংস করে দেবার চক্রান্তই করেনি, সে অনেকদিন থেকে জম্বু সরকারের বিরুদ্ধেও অভিযান চালিয়েছে। হাজারী টিম মানেই দেশের স্বনামধন্য ব্যক্তি আমরা হাজারী টিম।

অধিনায়ক দাঁত পিষে বললেন—পুলিশ মহল বড় অকেজো হয়ে পড়েছে, তারা এই এই দুস্কৃতিকারীদের গ্রেপ্তার করতে সক্ষম হচ্ছে না। আমার নির্দেশে কয়েকজন পুলিশ অফিসারকে চাকরি থেকে বরখাস্ত করা হলো তবু তেমন কোনো কাজ হচ্ছে না।

পঞ্চম অধিনায়ক বললেন—দেশে দিন দিন অরাজকতা বেড়েই চলেছে। দুস্কৃতিকারীর সংখ্যা বাড়ছে।

শুধু বাড়ছে নয়, সীমাহীনভাবে এরা মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে। আমরা যেভাবে দেশ চালনা করছি এরা তার বিরুদ্ধে অভিযান শুরু করেছে। এরা দেশের সর্বনাশ চায়। একটু থামলেন প্রধান অধিনায়ক, তারপর বলতে শুরু করলেন—জনগণের মঙ্গল সাধন উদ্দেশ্য নিয়েই তো আমরা জনদরদীর আসনে উপবিষ্ট হয়েছি। দেশের মঙ্গল কামনা করেই আমরা দেশের দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি ব্যাপারে উৎসাহী হয়েছি।

স্যার, এ কথা জনগণ যেন বুঝতেই চায় না। দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পেলে এতে দেশেরই তো লাভ মানে জনগণেরই তো লাভ বলা চলে।

ষষ্ঠ অধিনায়কের কথায় বললেন প্রধান অধিনায়ক—হাঁ, আপনি ঠিকই বলেছেন, দেশের উৎপন্ন দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধি এত আমাদের দেশেরই মঙ্গল, কারণ দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পেলে জনগণ চরমভাবে লাভবান হবে বা হচ্ছে।

দ্বিতীয় অধিনায়ক বলে উঠেন—এই সুন্দর সহজ কথাটা কিন্তু দেশের জনগণ মোটেই অন্তর দিয়ে গ্রহণ করে না বা বোঝার চেষ্টাও করে না। দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি হয়েছে আরও হচ্ছে এতে তারাই যথেষ্ঠ লাভবান হচ্ছে কারণ খাদ্যশস্য দেশের মাটিতেই উৎপন্ন হয়। যদি এই খাদ্যশস্য প্রচুর দরে বিক্রি হয় তাহলে তারাই সমৃদ্ধিশালী হতে পারছে......

তৃতীয় অধিনায়ক বলেন—তবু ঐ দুষ্ট শয়তান দুঃস্থ নামধারী জনগণ হা হা করে করে দেশ ও দশের শান্তি নষ্ট করছে।

হাঁ, সত্যিকথা বলেছেন—ঐ এক শ্রেণীর লোক আছে যারা দেশের আবর্জনা স্বরূপ, ওরা মরে যাওয়াই শ্রেয়। কথাটা বললেন পঞ্চম অধিনায়ক।

এবার বললেন প্রধান অধিনায়ক—ঐ দুষ্ট জনগণের হা কান্না কোনদিন থামবে না। ওরা যত পারে ততই আরও চাইবে। কাজেই ওরা চিৎকার করে গলা দিয়ে রক্ত ঝরাক সেদিকে আমাদের কান দেবার সময় নেই। আমরা কাজের লোক, সর্বদা কাজ করে যাচ্ছি। কেমন করে দেশ ও দশের মান-মর্যাদা রক্ষা পাবে এ চিন্তাই আমাদের একমাত্র ভাববার বিষয়। কে কোথা না খেয়ে মরলো এসব দেখবার বা শুনবার অবসর আমাদের নেই। তবে হ্যাঁ, যখন আমরা জনসভায় মঞ্চে দাঁড়িয়ে বক্তৃতা দেবো তখন অবশ্যি ঐ নগণ্য দুঃস্থ জনগণকে লক্ষ্য করেই কথা বলতে হবে, কারণ আপনারা সবাই জানেন। হাঁ, এবার কাজের কথায় আসা যাক, কেমন?

ঠিক বলেছেন, এবার কাজের কথা নিয়ে আলোচনা করা যাক। দেখুন হাজারী সাহেবকে কেউ বা কারা আটক করেছে এবং তার দ্বারাই আমাদের এ চিঠিগুলো লেখানো হয়েছে।

হাঁ, আপনার অনুমান সত্য তাতে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু সেই দুষ্কৃতিকারী যেন মনে রাখে হাজারী সাহেবকে আটক করে কোনো কিছু

করতে পারবে না। আমাদের হাজারী টিম যেমন চলেছে তেমনি চলবে। দেশের পণ্যদ্রব্য যদি দেশের বাইরে না যায় তবে কি করে দেশ সমৃদ্ধশালী হবে। কথাগুলো বলে থামলেন প্রধান অধিনায়ক।

চতুর্থ অধিনায়ক বললেন—হিপ্পির পণ্যদ্রব্য হারিয়ে আমরা একেবারে মুষড়ে পড়েছিলাম। পর পরই বেতসী ও ইজহার মাল পাঠিয়ে আবার কোনো রকমে সেইটার ক্ষতিপূরণ করলাম। তারপর পুনরায় কয়েকবার আমরা দুস্কৃতি দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হলাম। জানিনা কে সেই দুস্কৃতিকারী যে বারবার আমাদের এমন ক্ষতি সাধন করে চলেছে।

শুধু ক্ষতিসাধন করাই তার উদ্দেশ্য নয়। উদ্দেশ্য হাজারী টিমকে নিশ্চিহ্ন করে দেওয়া। যদি তাই না হবে তাহলে এত লুটতরাজ করা সত্বেও সে হাজারী সাহেবকে আটক করতো না।

আটক করেই সে ক্ষান্ত হয়নি। হাজারী সাহেবকে আটক করে তার কাছ থেকে জানিয়েছে আমাদের হাজারী টিমের সবার নাম ও ঠিকানা। এ চিঠিগুলোই তার প্রমাণ......

সপ্তম অধিনায়ক কথা কয়টি বলে থামলেন।

প্রথম এবং প্রধান অধিনায়ক বললেন—দুস্কৃতিকারীদের দৌরাত্ম্য বেড়ে গেছে চরমভাবে। এদের কেমন করে শায়েস্তা করতে হয় আমরা জানি। সব নষ্টের মূল ঐ দুঃস্থ অসহায় নামধারী জনগণ।

আপনি ঠিক বলেছেন জনাব। ওরাই দেশটাকে রসাতলে দিলো। দেশের সুখশান্তি সব বিনষ্টের কারণ ওরা। বললেন তৃতীয় অধিনায়ক।

চতুর্থ অধিনায়ক বললেন—এই সব দুঃস্থ জনগণকে কোনো এক ব্যক্তি উৎসাহ যুগিয়ে চলেছে সেই হলো সব নষ্টের মূল। তাকে শায়েস্তা না করতে পারলে দেশে শান্তি ফিরে আসবে না।

পঞ্চম অধিনায়ক বললেন—হাঁ, আপনি ঠিকই বলেছেন, সেই শয়তান দুষ্টলোকটিই আমাদের সর্বনাশের একমাত্র কারণ। আমাদের যে পণ্যদ্রব্যগুলো সীমান্তের বাইরে পাচার হয়ে যাচ্ছিলো সব সেই আটক করে দুঃস্থ নামধারী শয়তানগুলোর মধ্যে বিলিয়ে দিয়েছে।

প্রধান অধিনায়ক বললেন—হাঁ, আমাদের ক্ষতির পরিমাণ যদিও কোটি কোটি টাকা তবু আমরা ভেঙ্গে পড়িনি। এবার আমাদের কারবার আরও সাবধানে চালাতে হবে যেন একটি প্রাণীও জানতে না পারে। পুলিশ মহল আজকাল বড় অকেজো হয়ে পড়েছে।

ঠিক বলেছেন, পুলিশ মহল আজও সেই দুস্কৃতিকারীকে গ্রেপ্তার করতে সক্ষম হলো না। বড় অপদার্থ ওরা।

সে কারণেই কয়েকজন পুলিশ অফিসারকে চাকরি থেকে বরখাস্ত করা হয়েছে। তাদের অবহেলাই দৃস্কৃতিকারীকে প্রশ্রয় দিয়েছে এবং দিচ্ছে। হাঁ, আমাদের এ চিঠির ব্যাপারে মিঃ কোইসগিনকে জানিয়েছি অচিরে যেন হাজারী সাহেবের আটককারীকে খুঁজে বের করা হয় এবং তাকে শাস্তি দেওয়া হয়।

জনাব, আপনি এক্ষুণি পুলিশ প্রধানকে ফোন করুন যেন মিঃ কোইসগিন সহ এখানে চলে আসেন। এখানে বসেই আলোচনা চলবে।

অত্যন্ত সূতীক্ষ্ণ বৃদ্ধি নিয়ে সন্ধান চালাতে হবে। এতদিন সহ্য করলেও আর সহ্য করা সম্ভব নয়। কথাগুলো বলতে বলতে প্রধান অধিনায়ক রিসিভার তুলে নিলেন হাতে। তিনি জম্বু পুলিশ প্রধানের কাছে ফোন করলেন।

হাজারী টিমের প্রধান অধিনায়কের ফোন পেয়ে পিলে চমকে উঠলো পুলিশ প্রধানের। তিনি শশব্যস্তে বিনীত কণ্ঠে ফোনে জানালেন এক্ষুণি আমরা হাজির হচ্ছি স্যার।

যেমন কথা তেমনি কাজ।

কয়েক ঘন্টা নয়, কয়েক মিনিটের মধ্যে জম্বু পুলিশ প্রধান ইন্সপেক্টার মিঃ কোইসগিনসহ হাজির হলেন হাজারী টিমের অধিনায়কদের পাশে।

খাকি পোশাকে সজ্জিত হয়ে পুলিশ প্রধানদ্বয় এসে উপস্থিত হলেন হাজারী টিমের কক্ষমধ্যে, মিলিটারী কায়দায় ছালাম জানালেন তারা হাজারী টিমের অধিনায়কগণকে।

গোলটেবিলের চারপাশ ঘিরে বসেছিলেন অধিনায়কগণ। সবাই এরা দেশের হর্তা-কর্তা-বিধাতা। এরাই সরকার বাহাদুর, এরাই দেশের শাসন

এবং শোষণ কর্তাও বলা চলে। এক একজন ভাবগম্ভীর মুখে বসে আছেন। তাদের মুখোভাবে ফুটে উঠেছে দেশ রক্ষার বিরাট দায়িত্ববোধের ছাপ।

কেউ কেউ সিগারেট পান করছেন সোফায় হেলান দিয়ে। চিঠিগুলোর কথা এখন কিছুটা হালকা হয়ে এসেছে। এমন চিঠি দুষ্ট লোকেরা লিখেই থাকে তাই তারা নিশ্চিন্ত হতে চেষ্টা করছেন। পুলিশ প্রধানদ্বয় কক্ষমধ্যে প্রবেশ করলেও হাজারীটিম অধিনায়কগণ তাঁদের কোনো রকম সম্মান দেখানো সমীচীন মনে করলেন না কারণ তারাই তো অধিনায়ক। পুলিশ প্রধান যত সম্মানিত ব্যক্তিই হন না কেনো তাঁরা হলেন কর্মচারী কাজেই তাঁরা এনাদের কাছে অবজ্ঞার পাত্র।

একজন বললেন—বসুন আপনারা।

পুলিশ প্রধান আসন গ্রহণ করার পর কোইসগিন আসন গ্রহণ করলেন।

কিছুক্ষণ কক্ষমধ্যে সবাই নীরব।

পুলিশ প্রধান ও ইন্সপেক্টার কতকটা অপরাধীর মতই নিশ্চুপ বসে রইলেন হাজারী টিম অধিনায়কদের কি হুকুম জানার জন্য। মূল্যবান সিগারেটের ধূম্ররাশি কুন্ডলি পাকিয়ে পাকিয়ে কক্ষময় বিচরণ করে ফিরছে। মাথার উপরে কোনো বৈদ্যুতিক পাখা না চললেও কক্ষটি হিমশীতল আরামদায়ক। শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা রয়েছে, কাজেই অসুবিধা নেই কিছু।

মেঝেতে দামী কার্পেট বিছানো।

তুল তুলে নরম সোফায় এক একজন অধিনায়কের নাদুস্ নুদুস্ দেহগুলো যেন তলিয়ে আছে। সম্মুখের টেবিলে মূল্যবান নাস্তার স্তূপ।

পুলিশ প্রধান এবং ইন্সপেক্টার পরিবেশটা হৃদয়ঙ্গম করার চেষ্টা নিচ্ছিলেন, এমন সময় কথা বললেন প্রধান অধিনায়ক—আপনারা সম্পূর্ণ অকৃতকার্য ব্যক্তি বলে পরিচিত হয়েছেন। এটা শুধু আপনাদের জন্যই দুঃখজনক নয় আমাদের জন্যও এক কলঙ্ক। আজও আপনারা খুঁজে বের করতে সক্ষম হলেন না কে সেই দুষ্কৃতিকারী যে সবার চোখে ধূলো দিয়ে প্রকাশ্য দিবালোকে নিজের স্বার্থসিদ্ধি করে যাচ্ছে। দেশে প্রতিদিন লুটতরাজ রাহাজানি লেগেই আছে। হিপ্পির তিন কোটি টাকার মাল লুট হলো।

হিজলায় দশ ট্রাক মাল হানা দিয়ে কেড়ে নিয়ে গেলো। ফিরোজপুর সাত নৌকা পণ্য দ্রব্য তারা আটক করে ফেললো এবং এসব মাল তারা প্রকাশ্যে দুঃস্থ নামধারী বদমাইশদের মধ্যে দিনের আলোতে বিলিয়ে দিলো অথচ আপনারা পুলিশ মহল কিছু করতে পারলেন না?

পুলিশ প্রধান মাথা নিচু করে ঢোক গিলছিলেন। এবার তিনি একবার চোখ তুলে তাকিয়ে দেখে নিলেন প্রধান অধিনায়কের মুখখানা।

ইন্সপেক্টার কোইসগিনের অবস্থা আরও শোচনীয়, তিনি একেবারে মাটিতে মিশে গেছেন যেন। বুকটা তার প্রচণ্ডভাবে টিপ টিপ করছে। এক একটা হাতুড়ির ঘা মারছে যেন কেউ তাঁর হৃদপিণ্ডে।

প্রধান অধিনায়ক চুপ হতেই বলে উঠলেন দ্বিতীয় অধিনায়ক। শুধু অকৃতকার্যই নন, আপনারা অকৃতজ্ঞও বটে। সরকারের বেতনভোগী কর্মচারী হয়েও আপনারা সরকারের কাজে অবহেলা করেন।

এবার কোইস্গিন চুপ থাকতে পারলেন না, তিনি উঠে দাঁড়িয়ে বললেন—স্যার আপনারা যা খুশি তাই বলতে পারেন, তাই বলে আমরা অকৃতজ্ঞ নই। জীবন দিয়ে আমরা আপমাদের ডিউটি পালন করে যাই। অন্যায় অনাচার আমরা করি তা আপনাদের মতই মহান ব্যক্তিদের নির্দেশেই করি। অকৃতজ্ঞ আমরা নই স্যার।

কোইস্গিনের কথা শুনে কক্ষমধ্যে সবাই স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। আজ পর্যন্ত কোনো পুলিশ অফিসার তাঁদের সম্মুখে এভাবে কথা বলতে সাহসী হন নি আর একটা নগন্য পুলিশ ইন্সপেক্টার তাদের সম্মুখে দাঁড়িয়ে এভাবে কথা বললো! হাজারী টিমের অধিনায়কগণ ক্রুদ্ধ হয়ে উঠলেন।

প্রধান অধিনায়ক টেবিলে প্রচণ্ড আঘাত করে বললেন—এত বড় কথা, আমাদের মত লোকদের ইংগিতেই আপনারা অন্যায় অনাচার করেন!

হাঁ স্যার, করতে আমরা বাধ্য হই। জানি এটা অন্যায় করছি তবু মুখ বন্ধ করে নীরবে করে যেতে হয়, কারণ আমরা বেতনভোগী কর্মচারী। কত নির্দোষ মানুষকে আপনারা আমাদের দ্বারা শায়েস্তা করে নেন আবার কত দোষী কঠিন শাস্তি পাবার উপযোগী ব্যক্তি আপনাদের নির্দেশে বিনাদ্বিধায়

খালাস পেয়ে যায়, তাও করতে হয় আমাদেরকেই। বলুন স্যার, কি করে আমরা অকৃতজ্ঞ হলাম? কোইসগিন এক নিঃশ্বাসে কথাগুলো বললেন।

পুলিশ প্রধানের শরীরের রক্ত যেন জমে যাবার উপক্রম হয়েছে। কোইসগিন একজন সামান্য পুলিশ ইন্সপেক্টার হয়ে মহান নেতাদের মুখের উপর এভাবে কথা বলছেন, এ ভারী অন্যায় করছেন, তাতে কোনো ভুল নাই। এর পরিণতি কি তিনি ভেবে অস্থির হচ্ছেন।

অধিনায়কগণ সবাই চেয়ার ছেড়ে দাঁড়িয়ে পড়েছেন, তাঁদের মুখচোখের ভাব এমন হয়েছে এই বুঝি তাঁরা মিঃ কোইসগিনকে হত্যা করে ফেলবেন। বারবার তাকাচ্ছেন হাজারী টিমের অধিনায়কদের মুখের দিকে।

প্রধান অধিনায়ক অধর দংশন করে বললো—স্পর্ধা আপনার কম নয় ইন্সপেক্টর। জানেন আপনি কোথায় এবং কাদের সম্মুখে দাঁড়িয়ে কথা বলছেন?

জানি আপনারা দেশ ও দশের রক্ষক, নেতা, মহান ব্যক্তি, আপনারা যখন জনসমুদ্রের সম্মুখে মঞ্চে গিয়ে দাঁড়ান তখন কিন্তু আপনাদের আরও একটি রূপ আছে যা অনেকেই জানে না আর জানবেই বা কি করে আপনারা যে বিড়ালতপস্বী......

এই মূহূর্তে বেরিয়ে যান, বেরিয়ে যান বলছি। প্রধান অধিনায়ক চিৎকার করে বললেন।

কোইসগিন বললেন—থাকতে আসিনি বেরিয়ে যাবো বলেই এসেছি। সসম্মানে অভিবাদন জানিয়ে বেরিয়ে যান মিঃ কোইসগিন।

পুলিশ প্রধান দাঁড়িয়ে আছেন, তাঁর মুখোভাব অসহায় গোবেচারীর মত দেখাচ্ছে। মিঃ কোইসগিনের আচরণে তিনিও একেবারে মর্মাহত হয়েছেন। কোনো কথা যেন তাঁর কণ্ঠ দিয়ে বের হচ্ছে না।

প্রধান অধিনায়ক বললেন—দেখুন বেশি কথা বলতে চাই না মিঃ কোরেশী। হাজারী সাহেবকে কে বা কারা উধাও করেছেন এ কথা আপনি জানেন।

জানি স্যার, শুধু জানি নয় তাঁর অন্তর্ধানের পর থেকে তাঁর সন্ধানে সমস্ত জম্বুর এলাকা আমাদের পুলিশ বাহিনী চষে ফেলেছে অথচ.........

অথচ তাঁর কোন হদিস আপনারা করতে পারেননি, এই তো?

হাঁ স্যার।

শুনুন, হাজারী সাহেব জীবিত আছেন এবং তাঁকে এমন কোনো স্থানে আটক রাখা হয়েছে যেখানে পুলিশ মহল তো দূরের কথা মশা-মাছিও প্রবেশ করতে সক্ষম নয়।

স্যার, কি করে তাঁর সন্ধান পেলেন জানতে পারি কি?

এই দেখুন তাঁর স্বহস্তে লিখিত চিঠি। এবং এ কারণেই আপনাদের এখানে ডেকেছি। মিঃ কোইসগিন যা আচরণ করছেন তাতে তাঁকে ক্ষমা করা যায় না। অমন লোক এখানে না থাকাই বাঞ্ছনীয়।

এ ব্যাপারে আমি দুঃখিত এবং লজ্জিত স্যার। বললেন—জম্বু পুলিশ প্রধান মিঃ কোরেশী।

মিঃ কোইসগিনের আচরণে কক্ষমধ্যে একটা উত্তেজনাপূর্ণ ভাব বিরাজ করছিলো। এখন তো অনেকটা প্রশমিত হয়ে এসেছে। অধিনায়কগণ কেউ কেউ উত্তেজিত হয়ে আসন ত্যাগ করে উঠে দাঁড়িয়ে পড়েছিলেন, তারা এবার আসন গ্রহণ করলেন।

মিঃ কোরেশীও আসন গ্রহণ করেছেন।

এবার প্রধান অধিনায়ক বললেন—দেখুন, আপনি এই চিঠিগুলো পড়ে দেখুন।

কয়েকখানা চিঠি বের করে টেবিলে পুলিশ প্রধানের সম্মুখে রাখলেন প্রধান অধিনায়ক।

জম্বুর পুলিশ প্রধানের চোখে মুখে বিস্ময় ফুটে উঠলো, চিঠিগুলো, একই হাতের লেখা এবং চিঠির বক্তব্য এক, তিনি কিছু বুঝতে না পেরে তাকালেন প্রধান অধিনায়কের মুখে।

প্রধান অধিনায়ক বললেন—দুস্কৃতিকারী হাজারী সাহেবকে আটক করে তারই দ্বারায় এ চিঠি লিখিয়ে আমাদের সবাইকে শাসিয়েছে। দেখুন কত বড় সাহস সেই দুস্কৃতিকারীটার। মিঃ কোইসগিন চলে গিয়ে ভাল হয়েছে কারণ তাকে বিশ্বাস করা যায় না। যাকে বিশ্বাস করা যায় না তার সম্মুখে

গোপন কথাও বলা যায় না। মিঃ কোরেশী, জানি আপনি কোন সময় ভুল বশতঃ আমাদের গোপন কথা ফাঁস করবেন না। করলে আপনিও রক্ষা পাবেন না, এ কথাও স্মরণ রাখবেন।

জানি স্যার, তাছাড়া আপনাদের গোপন ব্যাপার এটা কোন অবস্থাতেই প্রকাশ করা উচিৎ নয়।

হাঁ, মনে রাখবেন, শুনুন হাজারী সাহেবকে বন্দী করে আমাদের সায়েস্তা করার বাসনা পোষণ করেছে দুস্কৃতিকারী। যাতে সে আমাদের কোন ক্ষতিসাধন করতে না পারে, সেদিকে নজর দেবার জন্যই আপনাকে আমরা ডেকেছি। জম্বুর রাজধানীর বুকেই আমরা থাকতে চাই। মিঃ কোরেশী আপনি আমাদের নিরাপত্তার দায়িত্বভার গ্রহণ করবেন।

নিশ্চয়ই স্যার।

আজ থেকেই পুলিশ ফোর্সের ব্যবস্থা করবেন বলে আশা করছি।

আপনাদের আদেশ পালনে সদা সর্বদা আমরা প্রস্তুত আছি।

প্রধান অধিনায়ক বললেন আবার—মিঃ কোরেশী কে সেই দুস্কৃতিকারী তার দৌরাত্ম দিনের পর দিন ভীষণভাবে বেড়েই চলেছে। যে হাজারী সাহেবকে বন্দী করে হাজারী টিমকে সায়েস্তা করার জন্য উন্মাদ হয়ে পড়েছে। আমাদের ইচ্ছা অচিরে সেই শয়তান দুস্কৃতিকারীকে গ্রেপ্তার করে সায়েস্তা করা। যতক্ষণ না সেই দুস্কৃতিকারী বন্দী হয়েছে ততক্ষণ আমরা নিশ্চিন্ত নই।

পুলিশ প্রধান বিনীতকণ্ঠে বললেন—স্যার, আমরা যথাসাধ্য চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি কিন্তু কোনক্রমে সেই দুস্কৃতিকারীকে গ্রেপ্তার করতে সক্ষম হচ্ছি না। পুলিশ মহল সদা সর্বদা জম্বুর সমস্ত জায়গা চষে ফিরছে কিন্তু তাকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।

খুঁজে বের করতে হবে মিঃ কোরেশী। জম্বুর প্রতিটি গর্তে, প্রতিটি ধূলি কণায় তার সন্ধান চালাতে হবে। এবার যদি আপনারা কৃতকার্য না হন তা হলে......কথা শেষ না করেই হাজারীটিমের প্রধান অধিনায়ক উঠে দাঁড়ালেন।

অন্যান্য সবাই আসন ত্যাগ করে উঠে পড়লেন।

মিঃ কোরেশীও নতমস্তকে দাঁড়ালেন বিনয়ের সঙ্গে তাঁর মুখোভাব অপরাধীর মত মনে হচ্ছিলো।

প্রধান অধিনায়ক বলে চলেছেন—আজ প্রায় দীর্ঘদিন ধরে এই দুস্কৃতিকারী জম্বুর বুকে দুস্কর্ম করে চলেছে অথচ আপনারা তাকে আজও......কথা শেষ না করে ক্রুদ্ধভাবে টেবিলে মুষ্টিঘাত করলেন সঙ্গে সঙ্গে উচ্চারণ করলেন—আজও তাকে আবিষ্কার করতে সক্ষম হলেন না আপনারা।

দ্বিতীয় অধিপতি বললেন—আবিষ্কার করা তো দূরের কথা তাকে আজও কেউ স্বচক্ষে দেখেছে বলে শুনলাম না। শুধু হাজারী সাহেব আর দু'একজন তার সঙ্গী সাথী ছাড়া।

হাঁ, এটাই আশ্চর্য দুস্কৃতিকারীটি কৌশলে তার কাজ চালিয়ে যাচ্ছে অথচ কেউ আজও তার কোন হদিস করতে পারলোনা। শুনেছি জমকালো পোশাক পরা, মাথায় পাগড়ি, পাগড়ির আঁচল দিয়ে মুখের নিচের অংশ ঢাকা তার সর্বক্ষণ। কথাগুলো বললেন তৃতীয় অধিনায়ক।

চতুর্থ অধিনায়ক বললেন—নিশ্চয়ই কোন দস্যু বা ডাকু হবে।

পঞ্চম অধিনায়ক বললেন—ডাকু তো বটেই না হলে অপরের সম্পদ ওমন করে কেড়ে নেয়।

প্রধান অধিনায়ক বললেন—সে ডাকু বা দস্যুই হউক তাকে অচিরে গ্রেপ্তারের ব্যবস্থা করতে হবে এবং হাজারী সাহেবকে তার কবল থেকে উদ্ধার করতেই হবে। মিঃ কোরেশী এ দায়িত্ব ভার আপনার উপরে রইলো। এখন যেতে পারেন আপনি।

মিঃ কোরেশী মাথা নেড়ে সম্মতি জানিয়ে বেরিয়ে গেলেন। যাবার সময় পুনরায় স্বসম্মানে ছালাম জানাতে ভুললেন না।

জম্বু পুলিশ প্রধান বেরিয়ে যেতেই প্রধান অধিনায়ক আসন গ্রহণ করে বললেন—বসুন আপনারা।

যারা দাঁড়িয়ে ছিলেন সবাই পুনরায় আসন গ্রহণ করলেন।

জম্বুর মহান নেতারা এবার নিজেদের গোপন আলোচনায় মেতে উঠলেন।

বললেন প্রধান অধিনায়ক—এতোবড় স্পর্দ্ধা একজন পুলিশ ইন্সপেক্টারের আমাদের মুখের উপর এমন কথা উচ্চারণ করতে সাহসী হলো।

অপর এক অধিনায়ক বললেন—আমি বিস্মিত হয়ে গেছি কোইসগিনের কথা শুনে। শুধু স্পর্দ্ধা নয় এর মধ্যে আমি লক্ষ্য করেছি বিরাট একটা বিদ্রোহীর ছাপ।

অন্য অধিনায়ক বলে উঠেন—হাঁ, সত্য কথা সরকারি চাকরিজীবির মুখে এমন বুলি। জনগণকে এ ধরণের বিদ্রোহীমনা ভাবাপন্ন কথাবার্তা আরও উত্তেজিত করে তুলবে তাতে কোন সন্দেহ নাই।

না এ ধরণের উক্তি যেন সে আর দ্বিতীয় বার উচ্চারণ করতে না পারে সেই কাজ করতে হবে। থামলেন প্রধান অধিনায়ক।

সবাই তখন তাকিয়ে আছেন প্রধান অধিনায়কের মুখের দিকে।

প্রধান অধিনায়ক বললেন—আমাদের যে লোক হাতে আছে, যারা আমাদের সমর্থন করে সেই যুবকদের ডেকে পাঠান এবং তাদের জানিয়ে দেন মিঃ কোইসগিনের উক্তিগুলোর কথা। শুধু কোইসগিন নন যারা এ ধরণের কথা মুখে উচ্চারণ করবে তাদের একটিকেও রেহাই দেওয়া হবে না। দাঁতে দাঁত পিষে কথাগুলো উচ্চারণ করলেন তিনি।

❑

পরদিন জম্বুর রাজ পথে পড়ে থাকতে দেখা গেলো মিঃ কোইসগিনের মৃত দেহ। তাকে কে বা কারা নির্মমভাবে হত্যা করেছে। দেহ থেকে মাথাকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করে ফেলা হয়েছে।

মিঃ কোইসগিনের মৃতদেহ দেখা সত্ত্বেও কোন জনগণ সেখানে ভীড় জমাতে সাহসী হলো না বা কোন রিপোটার ফটো নেবার জন্য ভীড় জমালোনা।

পুলিশ এক সময় মিঃ কোইসগিনের মৃত দেহ সরিয়ে ফেললো। যদিও অতি সহজ পরিবেশেই লাশ সরিয়ে ফেলা হলো তবুও শহরে কোইসগিনের নিহত ব্যাপার নিয়ে একটা চাঞ্চল্যতার সৃষ্টি হলো। কারা তাঁকে হত্যা করেছে, কেনো তাকে হত্যা করা হয়েছে, মিঃ কোইসগিনের হত্যা কি কোনো রকম রহস্যপূর্ণ, এ সব কোনো প্রশ্নের জবাব কেউ খুঁজে পেলো না।

মিঃ কোইসগিন পুলিশের লোক বলে সরকারিভাবে তদন্ত শুরু হলো। গোয়েন্দা বিভাগ তদন্তের ভার হাতে নিলেন। জোর তদন্ত চললো। পত্রিকায় নানাভাবে এই নৃশংস হত্যাকাণ্ডের খবরা খবর প্রকাশিত হতে লাগলো।

জম্বুর জনসাধারণ এই হত্যাকাণ্ডের শেষ সমাধা জানার জন্য উদ্গ্রীব ভাবে প্রতি দিন সংবাদ পত্রের পৃষ্ঠায় নজর বুলিয়ে চললো কিন্তু এই হত্যা কান্ডের কোনো সমাধান তারা পত্রিকা বা সংবাদপত্রের পৃষ্ঠায় দেখতে পেলেন না। কয়েকদিন বা কয়েক সপ্তাহ এই হত্যাকান্ডের বর্ণনা নানা ভাবে পত্রিকার পৃষ্ঠায় ফলাও করে প্রচারিত হলো। তারপর দেখা গেলো আর কোনো সংবাদ প্রচারিত হচ্ছে না এ হত্যালীলা সম্পর্কে।

কিন্তু কেনো এ হত্যালীলা নিয়ে আর কোনো সংবাদ প্রচারিত হলোনা এটা কেউ জানেনা বা বলতে পারলোনা।

মিঃ কোইসগিনের মত যারাই এই মহান নেতাদের নিয়ে কোনো কথা বলতে গেলো তারাই প্রাণ হারালো নৃশংসভাবে।

কারা এবং কেনো হত্যা করলো জানলোনা বা কেউ বুঝলোনা। মাঝে মাঝে দেখা যায় পথের ধারে কিংবা ডোবা খালে বিলে পড়ে আছে মস্তক বিহীন লাশ কিংবা হাত পা বাধা কোনো অসহায় ব্যক্তির মৃত দেহ।

হাজারী টিম হাজারী সাহেবকে হারিয়েও তাঁদের গোপন ব্যবসা থেকে ক্ষান্ত হলেন না। দেশের প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি এবং খাদ্যশস্য যখন যা দেশের মাটিতে উৎপন্ন হয়ে চললো তার তিন ভাগ খাদ্যশস্য জনগণের চোখে

ধূলো দিয়ে অত্যন্ত সর্তকতার সঙ্গে গোপনে দেশের বাইরে পাচার করে চললেন। অবশ্য নিজেরা সাধু সেজে জনসভায় চোরাচালানী আর এই ধরনের ব্যবসায়ীদের খুব কষে গালমন্দ করতে ভুললেন না, যেন তাঁদের উপর জনগণের আস্থা বদ্ধমূল হয়।

সাধুতার মুখোস পরে এক এক জন ভীষণ জনদরদী বনে গেলেন যেন আরও বেশি করে।

কিন্তু জনগণ জানেন এটা এদের উপরের রূপ আসল রূপ লুকানো আছে মুখোসের অন্তরালে।

জনদরদী নেতারা যতই গলা ফাটিয়ে জনহিতকর উক্তি উচ্চারণ করুননা কেনো, জনগণ বোঝেন, জানেন, ভিতরের আসল পরিচয়। অবশ্যি নেতারাও তা বোঝেন জনগণ তাদের প্রতি কতখানি আস্থাশীল তা তাঁরা অন্তরে অন্তরে বেশ ভাল ভাবেই উপলব্ধি করেন এবং এ কারণেই তাঁদের সাবধানতার অন্ত নাই। দেহরক্ষী ছাড়াও নিজেরা সর্বক্ষণ সজাগ সচেতন নিজেদের ব্যাপারে।

কিন্তু কতদিন?

কতদিন তারা জনগণের বুকের রক্ত এ ভাবে শোষণ করবেন। জনগণের মুখের গ্রাস নিয়ে ছিনি-মিনি খেলবেন। যত গোপনতার সঙ্গেই তারা জনগণের চোখে ভেল্কী-বাজী লাগিয়ে যাদু বিদ্যার কারসাজি খেলুন না কেনো? একদিন তাঁদের সাধুতার মুখোস জনগণই টেনে ছিঁড়ে, তাঁদের আসল রূপ সবার সম্মুখে তুলে ধরবে সেদিন, সেই সুনাম ধন্য মহান অধিনায়কদের বিচার হবে জনগণের আদালতে।

প্রধান অধিনায়ক হাসলেন—দেখলেন কোইসগিনের শেষ পরিণতি।

দ্বিতীয় অধিনায়ক বললেন—হাঁ, যারা আমাদের বিরুদ্ধে টুঁশব্দ করেছে, তাঁদের আমরা কিভাবে দুনিয়া থেকে সরিয়ে ফেলি। অতি কৌশলে, অতি সন্তর্পণে আমরা তাদের নিঃচিহ্ন করে দেই। তাদের মৃতদেহের সৎ কাজও পর্যন্ত হয় না। তাদের দেহের খণ্ড খণ্ড টুকরায় শিয়াল শকুনির উদর পূর্ণ হয়।

তৃতীয় অধিনায়ক বললেন—আমাদের বিরুদ্ধে বলেও তারা জীবিত থাকবে এ হতে পারে না, তাইতো আমরা এমন সুকৌশলে কাজ করে চলেছি।

চতুর্থ অধিনায়ক বললেন—শুধু সুকৌশলে আমরা একটি কাজই করছিনা, আমরা সব কিছুই করছি সুকৌশলে। আজ আমাদের জীবন সার্থক হয়েছে......

পঞ্চম অধিনায়ক বললেন—শুধু নামে যশেই নয় আমরা ধনসম্পদেও মানুষের মত মানুষ হয়েছি। হাজারী টিমের অধিনায়ক হবার পূর্বে আমাদের কি ছিলো? তেমন কিছুই ছিলো না, আজ গাড়ি-বাড়ি ঐশ্বর্যের ইমারত সব পেয়েছি শুধু একটি জিনিস আমরা পেলাম না তা ঐ দুঃস্থ অসহায় নামধারী-দুষ্ট জনগণের নির্ভরশীলতা এবং বিশ্বাস......

হাঁ, ওরা কোন দিনই আমাদের উপর ভরসা করতে চায় না। ওরা চায় দেশের সর্বনাশ, আমাদের উপর আস্থা হারানো মানেই দেশের উপর আস্থা হারানো....কথাগুলো বললেন সপ্তম অধিনায়ক।

এতোক্ষণ গভীর মনোযোগ দিয়ে শুনছিলেন হাজারীটিমের অষ্টম অধিনায়ক, এবার তিনি বললেন—ঐ আবর্জনাগুলোর নাম আপনারা মুখে আনবেন না। ওদের কথা স্মরণ করতেও শরীর ঘৃণায় কুঞ্চিত হয়, যত সব অপদার্থ......

প্রধান অধিনায়ক বললেন—চুপ, আস্তে বলুন ওরা আশে পাশেই থাকে সর্বক্ষণ, হঠাৎ শুনে ফেলবে। যত কাজ করতে হয় ওদের খুশি রেখেই করতে হবে বুঝলেন? দেশের জনগণ যদি বিগড়ে যায় তাহলে বড় মুস্কিল আছে। কামানের গোলা রদ করা যায় কিন্তু জনগণের বিক্ষোভ রদ করবার উপায় নেই কারো, কাজেই......একটু থেমে বললেন অধিনায়ক ওদের খুশি রেখেই কার্যসিদ্ধ করে যেতে হবে,......

বললেন দ্বিতীয় অধিনায়ক—জনগণকে না হয় যে কোন উপায়ে খুশি করা হলো কিন্তু ঐ জমকালো পোশাকধারী, সেই দুস্কৃতিকারীটিকে কেমন করে সে সায়েস্তা করবেন। হাজারীসাহেবকে আটক করে সে আমাদের সবার ঠিকানা সংগ্রহ করে নিয়েছে। যে কোন মুহূর্তে সে আমাদের উপর আক্রমণ চালাতে পারে।

প্রধান অধিনায়ক বললেন—পুলিশ প্রধানকে জানিয়ে দিয়েছি, আমাদের প্রতিটি অধিনায়কের বাসভবনের চার পাশে স্বশস্ত্র প্রহরী পাহারায় নিযুক্ত

থাকবে, যেন কোনো রকমে কেউ ফটক পেরিয়ে ভিতরে প্রবেশ করতে সক্ষম না হয়। এমন কি পিপীলিকাও যেন প্রবেশ করতে না পারে।

তাতো বুঝলাম কিন্তু যখন আমরা বাসভবনের বাহিরে যাবো তখনও তো আমাদের উপর হামলা চলতে পারে? কথাটা বললেন চতুর্থ অধিনায়ক।

জবাব দিলেন প্রধান অধিনায়ক—যখনই আমরা বাসভবন ত্যাগ করবো তখনই আমাদের দেহরক্ষী হিসাবে পুলিশ ফোর্স নিযুক্ত থাকবে কেউ যেন আমাদের কেশাগ্র স্পর্শ করতে সক্ষম না হয়।

❑

জম্বু পুলিশ প্রধানের চোখে আজ ক'দিন হলো ঘুম নাই। তিনি যেন একেবারে মরিয়া হয়ে উঠেছেন। সদা সর্বদা পুলিশ বাহিনীর উপর কড়া নির্দেশ দিয়ে যাচ্ছে, যেন তারা সর্বক্ষণ সজাগ এবং সতর্কতার সঙ্গে নিজ নিজ দায়িত্ব পালন করে চলেন। দেশের ভূত ভবিষ্যৎ পুলিশবাহিনী। দেশের শান্তিশৃঙ্খলা রক্ষাকারী তারাই। তারা যদি কোনো রকম শান্তি শৃঙ্খলা বজায় রেখে না চলতে পারে—তা হলে দেশ রক্ষা করা কিছুতেই সম্ভব হবে না।

পুলিশ প্রধান যে ভাবে নির্দেশ দিচ্ছেন সেইভাবে কাজ করে যাচ্ছেন অন্যান্য পুলিশ অফিসারগণ! অফিসারগণ আবার যে ভাবে পুলিশের নির্দেশ দিচ্ছে, পুলিশ ফোর্স সেইভাবে আদেশ পালন করে যাচ্ছেন। পুলিশ বাহিনী বা পুলিশ মহল তো হুকুমের চাকর।

পুলিশ প্রধান এতো করেও নিশ্চিত হতে পারছেন না, তিনি অত্যন্ত উদ্বিগ্নতার সঙ্গে কাল-কাটাচ্ছেন। স্বনামধন্য ব্যক্তিদের নির্দেশ তাঁকে মেনে চলতেই হবে, না হলে তাকেও মিঃ কোইসগিনের মত নৃশংসভাবে প্রাণ হারাতে হবে কিংবা চাকরি থেকে সরে পড়তে হবে।

ক'দিনের মধ্যেই মিঃ কোরেশীর মাথার সম্পূর্ণ চুল পেকে সাদা হয়ে উঠলো। সব সময় তাঁর মনে উৎকুণ্ঠা না জানি কোন মুহূর্তে জম্বুর কোন স্থানে দুস্কৃতিকারী হানা দিয়ে বসে। যদি কোনো অধিনায়কের বাস ভবনে হানা পড়ে বা কোনো অঘটন ঘটে তা হলে কৈফিয়ৎ দিতে হবে তাকেই।

মিসেস কোরেশী স্বামীকে সদাসর্বদা ব্যস্ত এবং চিন্তিত দেখে একদিন বললেন—চাকরি করছো বলেই দিন রাত এ ভাবে দুঃশ্চিন্তা করবে? শুধু দুশ্চিন্তা নয় সর্বক্ষণ পোশাক পরে ছুটাছুটি করে বেড়াচ্ছ। তোমার চেহারার দিকে একবার তাকিয়ে দেখেছো? এ ক'দিনের মধ্যেই একেবারে যাতা হয়ে গেলো। দেহ আধখানা হয়ে গেছে। চোখের নিচে কালি পড়েছে, সম্পূর্ণ চুল পেকে সাদা হয়ে গেলো......

যেতে দাও! সব যেতে দাও। গিন্নি এমন দেশে বেঁচে থেকে কোনো লাভ নেই। যে দেশে সুখ নেই, শান্তি নেই, সে দেশে বেঁচে থেকে কি হবে বলো? এতো বড় একটা চাকরি করি, দেশের মানুষ কত সম্মান করে, ভয়ও করে, তবু কোন মুহূর্তে আমি নিশ্চিন্ত হতে পারিনি। দেশের অধিনায়কদের খুশি করতে গিয়ে মনের বিরুদ্ধে আমাকে অনেক কাজ করতে হচ্ছে যা করতে গিয়ে আমি আমার বিবেকের কাছে ধিক্কার পেয়েছি। গিন্নি অধিনায়কদের আদেশ কে বা কারা তাঁদের পিছু নিয়েছে এবং তাঁদের গোপন দল যার নাম "হাজারী টিম" সেই দলের নেতাকে আটক করেছে, সেই দুস্কৃতিকারীকে খুঁজে বের করতে হবে।

নইলে?

নইলে চাকরি খোয়া যাবে নিঃসন্দেহে।

তা হলে উপায়?

উপায় চিন্তা করতে গিয়েই বুড়িয়ে গেলাম গিন্নি একেবারে ভেঙ্গে পড়লাম; হতাশ হয়ে পড়েছি চাকরিটা বুঝি আর রক্ষা পাবে না।

তুমি নিজে এতো বেশি উতলা হচ্ছো কেনো? অন্যান্য পুলিশ অফিসারদের আদেশ করো।

তুমি বুঝবেনা গিন্নি, জম্বু পুলিশ মহল একেবারে হীমসীম খেয়ে গেছে। সমস্ত শহর তন্ন তন্ন করে খুঁজে ফিরেছে। কিন্তু কোথাও সেই দুস্কৃতিকারীর সন্ধান পাওয়া যায় নাই।

ওগো আমার বড্ড ভয় করছে, দেখলে তো মিঃ কোইসগিনের অবস্থা। দেখলে তো তাঁকে কে বা কারা কি নির্মমভাবে হত্যা করেছে। আহা বেচারীর শেষ পরিণতি এই ছিলো। তুমি সাবধানে থাকবে, সাবধানে চলাফেরা করবে, দেশের সর্বত্র যেন একটা ভীষণ ত্রাস বিরাজ করছে। জীবনের এতোটুকু নিরাপত্তা নেই কারো।

গিন্নি সরকারি চাকরি করি সব সময় সরকারের নির্দেশ মেনে চলতে হয়। আমাদের কোনো ভীতি ডর করে চললে চলবে বলো? যত ত্রাসের সৃষ্টিই হোকনা কেনো ডিউটি পালন করতেই হবে, আইন মেনে চলতেই হবে আমাদের।

কিন্তু......

কোনো কিন্তু নেই, যত ঝড় বৃষ্টি তুফান হোক। যত মহামারী কিংবা দুর্যোগ চলুক তবু আমাদের নিস্তার নেই।

চাকরি করো বলেই......

হাঁ, এরই নাম পুলিশের চাকরি।

জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে বলেন মিসেস কোরেশী—দেখছো ভীষণ মেঘ করেছে তুমি বাইরে যাবে।

হাঁ, না গেলেই নয়, কারণ যেমন করে হোক সেই জমকালো পোশাকধারী দুস্কৃতিকারীকে খুঁজে বের করতেই হবে নইলে আমার চাকরি তো যাবেই, তা ছাড়া.........কথা শেষ না করেই থামলো মিঃ কোরেশী।

মিসেস কোরেশীর সমস্ত মুখে ছড়িয়ে পড়লো একটা দুঃচিন্তার ছাপ।

❑

বনহুর হাজারী সাহেবের বুকে রিভলভার চেপে ধরে বলিষ্ঠ কণ্ঠে বললো—বলুন আপনি বিশ্বাসঘাতকতা কেনো করেছিলেন? বলুন, জবাব দিন আমার প্রশ্নের?

হাজারী সাহেব করুণ কণ্ঠে বললেন—এবারের মত ক্ষমা করে দিন আর কোনোদিন এমন বিশ্বাসঘাতকতা করবোনা।

দাঁতে দাঁত পিষে বললো বনহুর—প্রথম বারও আপনি এমনিভাবে নিজেদের অন্যায়ের জন্য ক্ষমা ভিক্ষা চেয়ে নিয়ে ছিলেন স্মরণ আছে সে কথা?

আছে!

তবু সাহস হলো পুনরায় ক্ষমা ভিক্ষার।

দেখুন ভুল হয়েছে।

ভুল! ভুল মানুষের একবারই হয়। বার বার আপনাদের ভুল হবে, যেমন চিরদিন আপনারা ভুল করে এসেছেন?

বড্ড ক্ষুধা পেয়েছে। আজ তিনদিন আমি খাই না!

আ-হা বড় আফসোস্। এবার তা হলে ক্ষুধা কেমন আচ করতে পেরেছেন? লক্ষ লক্ষ দুঃস্থ জনগণের মুখের গ্রাস কেড়ে নিয়ে আপনারা ঐশ্বর্যের ইমারতে বসে পা দুলিয়ে দুলিয়ে শাহান শাহ্ খাবারে উদর পূর্ণ করেন। আর সেই লক্ষ লক্ষ দুঃস্থ মানুষ, দিনের পর দিন ক্ষুধার জ্বালা নীরবে সহ্য করে যায়...মনে করুন হাজারী সাহেব—ক্ষুধার জ্বালা কেমন!

আমাকে ক্ষমা করুন। আমি জীবনে আর কোনদিন অন্যায় কাজ করবো না। দেশের সম্পদ সীমান্তের ওপারে পাচার করবোনা। হাজারীটিম ভেঙ্গে দেবো বিশ্বাস করুন আপনি...

বনহুর এবার হাতে তালি দিলো, সঙ্গে সঙ্গে দু'জন অনুচর এলো সেখানে।

হাজারী সাহেব মনে করলেন এবার বুঝি তাকে মুক্তি দেওয়া হবে। বুঝি ক্ষমা পেলেন তিনি কিন্তু ক্ষমা নয়। আদেশ দিলো বনহুর—নিয়ে যাও হাজারী সাহেবকে, কোনো এক ধনাগারে বন্ধ করে রাখো। শুধু ধন-সম্পদ উনি ভক্ষণ করবেন।

হাজারী সাহেব চোখে সর্ষে ফুল দেখলেন। কেঁদে ফেললেন তিনি হাঁউ মাউ করে।

বনহুর বললেন—নিয়ে যাও, খবরদার হাজারীটিমের একটি মহাত্মাকেও যেন হত্যা করা না হয়। হত্যা করলে অতি সহজেই এরা বিদায় নিয়ে চলে যাবেন। ক্ষুধার কি জ্বালা সেটা ঠিকভাবে অনুভব করতে পারবেন না। এদের প্রত্যেকটি ব্যক্তিকে ক্ষুধার জ্বালা অনুভব করার সময় দাও। যাও......

হাজারী সাহেব আর্তনাদ করে উঠলেন।

বনহুর তখন বেরিয়ে গেছে সে কক্ষ থেকে। সোজা সে আস্তানার বাইরে গিয়ে দাঁড়ালো। পাশেই অপেক্ষা করলো তার প্রিয় অশ্ব তাজ। বনহুর তার অনুচরদের কিছু বললো—তারপর চেপে বসলো তাজের পিঠে।

তাজ উল্কা বেগে অদৃশ্য হলো।

জম্বুর পাথরিয়া শুকনো মাটিতে জেগে উঠলো বনহুরের ঘোড়ার খুরের শব্দ।

❑

হাজারী টিমের অধিনায়কদের গোপন বৈঠক চলছিলো। নানা রকম আলাপ আলোচনার পর তারা যে মুহূর্তে আসন ত্যাগ করবেন ঠিক ঐ মুহূর্তে জমকালো পোশাক পরিহিত দস্যু বনহুর লাফিয়ে পড়লো পাশের জানালা দিয়ে কক্ষ মধ্যে।

দু'হাতে তার দুটি রিভলবার।

তার দেহের পোশাকের সঙ্গে যেন মিশে গেছে তার হাতের রিভলবার দুটো।

কক্ষ মধ্যে সবাই ভয়ে বিস্ময়ে চমকে উঠলো। যে দণ্ডে বনহুর কক্ষ মধ্যে লাফিয়ে পড়লো সেই দণ্ডেই মহান নেতাদের পিলে চমকে উঠলো, তারা বুঝতে পারলেন এই সেই ব্যক্তি যার কথা হাজারী সাহেবের মুখে তারা শুনেছিলেন। এই সেই ব্যক্তি যে তাদের কোটি কোটি টাকার পণ্য দ্রব্য লুট করে নিয়ে বিলিয়ে দিয়েছে দুঃস্থ জনগণের মধ্যে স্বচক্ষে সেই ত্রাসপূর্ণ ব্যক্তিকে তারা দেখতে পাবেন একথা কোনো সময় ভাবেননি। তা ছাড়া

তাদের বাড়ির চারপাশে সুদক্ষ সশস্ত্র প্রহরী রীতিমত পাহারা দিয়ে চলেছে। কিভাবে এই ভয়ঙ্কর লোকটি প্রবেশ করলো।

সবাই স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন, কারো মুখে কোনো কথা নাই। যেন আড়ষ্ট হয়ে গেছেন তাঁরা। বললেন প্রধান অধিনায়ক—কে তুমি? এবং এই প্রাসাদের মধ্যে প্রবেশ করলে?

আমি কে একটু পরেই জানতে পারবেন, আর এসেছি আপনাদের সদর দরজা দিয়ে।

প্রহরী! সশস্ত্র প্রহরী পাহারায় রয়েছে তবু তুমি কি করে...

মৃত্যু যখন আসন্ন হয়ে আসে তখন সশস্ত্র প্রহরী কেন লৌহ প্রাচীর ভেদ করেও আজরাইল এসে উপস্থিত হয়, এ কথা ভুলে গেছেন মহাত্মাগণ। আপনাদের সময় শেষ হয়ে এসেছে।

তুমি কি আমাদের হত্যা করতে চাও? বললেন প্রধান অধিনায়ক।

বনহুর হেসে বললো—এতো সহজে বিদায় নিতে চান? না, আপনাদের একজনকেও আমি স্বহস্তে হত্যা করবো না। যাদের মুখের গ্রাস নিয়ে আপনারা ছিনিমিনি খেলেছেন তাদের হাতেই সঁপে দেবো আপনাদেরকে। তারা যা ভাল মনে করেন তাই করবেন। আপনাদের বিচার হবে জনগণের আদালতে। আমি তো আজরাইল বিচারের পর জান কবজের পালা আমার।

সবার মুখমণ্ডল মরার মুখের মত ফ্যাকাশে হয়ে উঠেছে। এ ওর মুখের দিকে অসহায়ভাবে তাকাচ্ছেন। যে অধিপতিদের আধিপত্যে সমস্ত দেশ ও দেশের জনগণের ত্রাহি ত্রাহি অবস্থা ছিলো, সেই মহান নেতাদের অবস্থা ফাঁদে পড়া বগার মত হলো।

বনহুর বাম হাতের রিভলবার টিপলো সঙ্গে সঙ্গে এক রাশ ধোঁয়া ছড়িয়ে পড়লো কক্ষটার মধ্যে। বনহুর তখন নিজের মুখে এক ধরণের মুখোস পরে নিয়েছে। ধোয়াটা কক্ষমধ্যে ছড়িয়ে পড়তেই মহান অধিপতিরা টলতে লাগলো মাতালের মত।

বনহুর শিস দিলো—সঙ্গে সঙ্গে কয়েকজন অনুচর প্রবেশ করলে জানালা দিয়ে ভিতরে। তাদের প্রত্যেকের মুখে অদ্ভুত ধরণের মুখোস পরা রয়েছে।

ততক্ষণে অধিনায়কগণ সবাই ঢলে পড়েছে মেঝেতে।

বনহুর অনুচরদের নির্দেশ দিলো—মহান অধিপতিদের তুলে নিতে।

অনুচরগণ এক একজন অধিপতিকে কাঁধে তুলে নিয়ে সিঁড়ি বেয়ে নিচে নেমে চললো।

প্রহরীগণ সবাই তখন যার যার জায়গায় মূর্তির মত দাঁড়িয়ে আছে। সবাই জ্ঞান শূন্য তাতে কোন সন্দেহ নাই।

অবশ্য বনহুর ক্লোরফরম গ্যাস দ্বারা সবাইকে অজ্ঞান করে ফেলেছিলো এবং তা সে করেছিলো অতি সুকৌশলে।

সবাইকে নামানো হলো নিচে।

প্রধান অধিপতির বাড়ির অদূরে অন্ধকারে অপেক্ষা করছিলো একটি খালি পুলিশ ভ্যান। বনহুরেরই এক অনুচর পুলিশ ড্রাইভারের বেশে ড্রাইভ আসনে বসেছিলো।

অধিনায়কদের সবাইকে এক একটা পুটলি বানিয়ে ভ্যানে উঠিয়ে নেওয়া হলো। পথচারী দু'চারজন যারা রাজ পথে যাচ্ছিলো তারা মনে করলো হয়তো বা কোনো মাল পাচার হচ্ছে তাই তারা তেমন করে সাহস পেলোনা দাঁড়িয়ে দেখার।

ভ্যান বোঝাই হলো তারপর ড্রাইভার ভ্যান ছাড়লো।

বনহুর তার জমকালো তাজের পিঠে বসলো। জমাট অন্ধকারে শোনা গেলো অশ্ব পদশব্দ। জম্বুর ঘুমন্ত শহরের পাষাণ প্রাচীরগুলো থর থর করে কেঁপে উঠলো সেই শব্দে।

❑

সংজ্ঞা ফিরে এসেছে, সবগুলো অধিনায়কের। তাঁদের চোখে মুখে বিস্ময়, এ তারা কোথায় এসেছে। কেমন করে এসেছে কে তাঁদের এনেছে। একটা ছোট্ট ঘরে তারা সবাই বন্দী।

ধীরে ধীরে স্মরণ হতে লাগলো সব কথা। প্রধান অধিনায়কের বাড়িতে তাঁদের গোপন বৈঠক হচ্ছিলো। বৈঠক প্রায় শেষ হয়েছে এমন সময় হঠাৎ যমদূতের মত এক ব্যক্তি গবাক্ষ পথে প্রবেশ করেছিলো সেই কক্ষ মধ্যে।

সেই জমকালো বলিষ্ঠ চেহারা লোকটাকে? তার দুই হাতে ছিলো দু'খানা রিভলবার। একরাশ ধোঁয়া ছড়িয়ে পড়লো সমস্ত কক্ষে তারপর আর কোনো কথা মনে নেই তাদের। যারা রাজ প্রাসাদসম বাসভবনে নরম গদির সোফায় বসে দিন কাটান, তারা কিনা এমন কঠিন পাথুরে মেঝেতে বসে থাকতে পারেন? ব্যথা হয়ে গেছে মাখনের মত কোমল দেহগুলো।

কক্ষ মধ্যে কোনো আলো নেই।

উপরে ছোট্ট একটি ভ্যান্টিলেটার। ঐ ভেন্টিলেটারের মধ্য দিয়ে যৎকিঞ্চিৎ আলো প্রবেশ করছিলো কক্ষ মধ্যে। অধিনায়কবৃন্দ এ ওর মুখ স্পষ্ট দেখতে না পেলেও তাঁরা একে অপরকে ঠিক চিনতে পারছিলেন। হঠাৎ এমন একটা অবস্থার জন্য মোটেই তারা প্রস্তুত ছিলো না। তাঁদের ভাগ্যাকাশ যে এমন করে অপরিচ্ছন্ন হবে এটাও তারা ভাবতে পারেননি কোনোদিন।

রাগে দুঃখে অধর দংশন করতে লাগলেন সবাই। এতো পুলিশ পাহারা থাকা সত্ত্বেও কি করে তাঁদের অন্তপুরে জমকালো পোশাকধারী প্রবেশে সক্ষম হলো তারা ভেবে পাচ্ছেন না। পুলিশগণ অপদার্থ এটাই তারা নিজেরা ক্রোধের সঙ্গে বার বার উচ্চারণ করে চললেন।

কয়েক ঘন্টার মধ্যেই মাখনদেহী মহান নেতারা হাঁপিয়ে উঠলেন। যারা দুগ্ধ ফেনিল শয্যায় শয়ন করেন। গালিচা বিছানো মেঝেতে পদচারণ করেন। মসৃণ মুখ দর্শন খাবার টেবিলে বসে সাহেবী খানা খান। এমন অবস্থার কথা তারা ভাবতেও পারেন না কোনোদিন। আজ সেই নির্মম অবস্থায় এসে পৌঁছেছেন তারা মহান অধিনায়কগণ।

মানুষের অদৃষ্ট এক মহা পরীক্ষা।

সেই মহাপরীক্ষায় সম্মুখীন এখন তারা। অস্থির হয়ে পড়েছিলেন সবাই, ক্ষুধা পিপাসায় তো কাতর হয়েই পড়েছেন। তারপর এক একজন

অধিনায়কদের চা সিগারেট পানের নেশা আছে, এরা একমুহূর্ত নেশা ত্যাগ করতে অভ্যস্ত নন। অথচ দুটোদিন হলো তারা এ অবস্থায় আছেন। মরিয়া হয়ে উঠেছেন সবাই।

পুরো দুটো দিন অতিবাহিত হবার পর হঠাৎ দরজা খুলে গেলো।

সবাই ব্যাকুল আগ্রহে তাকালেন দরজার দিকে। মুহূর্তে তাদের মুখ ফ্যাকাশে রক্ত শূন্য হয়ে পড়লো। কক্ষের দরজায় দাঁড়িয়ে আছে সেই জমকালো মূর্তি—তার পিছনে কয়েকজন বলিষ্ঠ চেহেরার লোক। সবার হাতেই মশাল শুধু জমকালো মূর্তি ছাড়া।

প্রধান অধিনায়ক সবার সম্মুখে। তারা দাঁড়িয়ে পড়ছেন সবাই।

জমকালো পোশাক পরিহিত দস্যু বনহুর বললো—বন্ধুগণ আপনারা আমার অতিথি। জানতে এলাম কেমন আছেন?

অধিনায়কগণ জমকালো মূর্তির পরিহাসজনক উক্তি নীরবে সহ্য করে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। মুখোভাব অপরাধীর মত করুন বিষণ্ন বিবর্ণ দেখাচ্ছে।

অধিনায়ক প্রধান বললেন—তুমি কেন আমাদের এখানে এসেছো? বলো কি চাও তুমি আমাদের কাছে?

অধিনায়ক প্রধান ভেবেছেন কিছু মোটা পয়সা পেলেই জমকালো মূর্তি তাঁদেরকে মুক্তি দেবে। সেই রকম মনোভাব নিয়েই কথাটা বললেন প্রধান অধিনায়ক।

বনহুর তার কথা শুনে অট্টহাসি হেসে উঠে বললো—কেন আপনাদের এনেছি তার জবাব হাজারী সাহেব দেবেন। দ্বিতীয় প্রশ্নের জবাব অবশ্য আমিই দিচ্ছি। আমি কিছু চাইনা, যারা আপনাদের কাছে পাওনাদার রয়েছে তারাই নেবেন নিজেদের পাওনা পূরণ করে। পিছন দিকে লক্ষ্য করে বললো বনহুর—রাম সিং?

বলুন সর্দার?

হাজারী সাহেবকে নিয়ে এসো।

তাকে আনতে গেছে।

বেশ।

একটু পরে দু'জন বলিষ্ঠ লোক হাজারী সাহেবকে নিয়ে এলো।

প্রথমে হাজারী সাহেবকে চিনতেই পারলেন না। তার পরম বন্ধু স্থানীয় মহান অধিপতিগণ। কিন্তু একটু পরেই তারা চিনতে পারলেন এবং ব্যাকুল কণ্ঠে বললেন—হাজারী সাহেব আপনি!

হাজারী সাহেব যেন এ ক'দিনে একটা জীবন্ত কঙ্কাল বনে গেছে। চোখ দুটো ঘোলাটে, চুলগুলো রুক্ষ, পাগলের চুলের মত এলোমেলো। হাজারী সাহেব প্রথমে কিছু বুঝতেই পারলেন না। চোখে তাঁর উন্মাদের দৃষ্টি। আজ দু'সপ্তাহ তার মুখে অন্ন পড়েনি বা প্রাণ ভরে পানি পান করেনি। সামান্য একটি শুকনো রুটি তাকে দেওয়া হয়েছে আর এক কাপ পানি, যেন হাজারী সাহেব জীবনে বেঁচে থাকেন। ক্ষুধার কেমন জ্বালা তা তিল তিল করে অনুভব করবার সুযোগ পাচ্ছেন হাজারী সাহেব।

প্রথমে না চিনলেও একটু পরেই চিনতে পারলেন যে মুহূর্তে হাজারী টিমের অধিপতিগণ তাকে জড়িয়ে ধরে বললেন—হাজারী সাহেব আপনি...আপনার এ অবস্থা...

হাজারী সাহেব হাঁউ মাঁউ করে কেঁদে উঠলেন একটা শিশু ছেলের মত। কাঁদতে কাঁদতে তিনি বললেন—আজ দু'সপ্তাহ মুখে অন্ন পড়েনি। কেনো আপনারা আমাকে দিয়ে এ সব অসৎ ব্যবসা চালিয়েছিলেন? বলুন, কেনো কেনো আপনারা আমাকে আপনাদের দলে টেনে নিয়েছিলেন......হাজারী সাহেব এবার কঠিনভাবে চেপে ধরলেন প্রধান অধিনায়কের গলা।

প্রধান অধিনায়ক উন্মাদ প্রায়, হাজারীর কবল থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে নেবার আপ্রাণ চেষ্টা করতে লাগলো। অন্যান্য অধিনায়কগণও প্রধান অধিনায়ককে সহায়তা করছেন কিন্তু হাজারী সাহেব একেবারে এটে ধরেছেন কিছুতেই ছাড়ছেন না।

দাঁতে দাঁত পিষে কঠিন কণ্ঠে বললেন বনহুর—হাজারী সাহেবকে দেখে আপনারা নিজেদের পরিণতির কথা স্মরণ করুন মহামান্য অধিনায়কগণ।

বনহুরের কথা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে দরজা আপনা-আপনি বন্ধ হয়ে গেল। জমাট অন্ধকারে আচ্ছন্ন হলো কক্ষটা।

বেশ।

একটু পরে দু'জন বলিষ্ঠ লোক হাজারী সাহেবকে নিয়ে এলো।

প্রথমে হাজারী সাহেবকে চিনতেই পারলেন না। তার পরম বন্ধু স্থানীয় মহান অধিপতিগণ। কিন্তু একটু পরেই তারা চিনতে পারলেন এবং ব্যাকুল কণ্ঠে বললেন—হাজারী সাহেব আপনি!

হাজারী সাহেব যেন এ ক'দিনে একটা জীবন্ত কঙ্কাল বনে গেছে। চোখ দুটো ঘোলাটে, চুলগুলো রুক্ষ, পাগলের চুলের মত এলোমেলো। হাজারী সাহেব প্রথমে কিছু বুঝতেই পারলেন না। চোখে তাঁর উন্মাদের দৃষ্টি। আজ দু'সপ্তাহ তার মুখে অন্ন পড়েনি বা প্রাণ ভরে পানি পান করেনি। সামান্য একটি শুকনো রুটি তাকে দেওয়া হয়েছে আর এক কাপ পানি, যেন হাজারী সাহেব জীবনে বেঁচে থাকেন। ক্ষুধার কেমন জ্বালা তা তিল তিল করে অনুভব করবার সুযোগ পাচ্ছেন হাজারী সাহেব।

প্রথমে না চিনলেও একটু পরেই চিনতে পারলেন যে মুহূর্তে হাজারী টিমের অধিপতিগণ তাকে জড়িয়ে ধরে বললেন—হাজারী সাহেব আপনি...আপনার এ অবস্থা...

হাজারী সাহেব হাঁউ মাঁউ করে কেঁদে উঠলেন একটা শিশু ছেলের মত। কাঁদতে কাঁদতে তিনি বললেন—আজ দু'সপ্তাহ মুখে অন্ন পড়েনি। কেনো আপনারা আমাকে দিয়ে এ সব অসৎ ব্যবসা চালিয়েছিলেন? বলুন, কেনো কেনো আপনারা আমাকে আপনাদের দলে টেনে নিয়েছিলেন......হাজারী সাহেব এবার কঠিনভাবে চেপে ধরলেন প্রধান অধিনায়কের গলা।

প্রধান অধিনায়ক উন্মাদ প্রায়, হাজারীর কবল থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে নেবার আপ্রাণ চেষ্টা করতে লাগলো। অন্যান্য অধিনায়কগণও প্রধান অধিনায়ককে সহায়তা করছেন কিন্তু হাজারী সাহেব একেবারে এটে ধরেছেন কিছুতেই ছাড়ছেন না।

দাঁতে দাঁত পিষে কঠিন কণ্ঠে বললেন বনহুর—হাজারী সাহেবকে দেখে আপনারা নিজেদের পরিণতির কথা স্মরণ করুন মহামান্য অধিনায়কগণ।

বনহুরের কথা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে দরজা আপনা-আপনি বন্ধ হয়ে গেল। জমাট অন্ধকারে আচ্ছন্ন হলো কক্ষটা।

অধিনায়কগণ চোখে শর্ষে ফুল দেখতে লাগলেন। এতো নিজেদের স্বার্থে দেশবাসীদের সঙ্গে যে বিশ্বাসঘাতকতা করেছেন আজ তার প্রায়শ্চিত্ত শুরু হলো।

বনহুর ফিরে চললো, তার পিছনে মশাল হাতে এগিয়ে চললো তার অনুচরগণ।

বললো বনহুর—যারা দেশের সর্বনাশের মূল—যারা দেশের এই দুর্বিসহ অবস্থার জন্য দায়ী, যারা জনগণকে নিয়ে ছিনিমিনি খেলছে, সেই মহা নায়কদের আমি বন্দী করে আনতে সক্ষম হয়েছি। রামসিং রহমান তোমাদের সকলের সহায়তায় আমি এত বড় একটা কঠিন কাজ আয়ত্বে আনতে পেরেছি। পুলিশ মহলকে এরা নাচের পুতুল বানিয়ে তাদের দিয়ে যেমন খুশি তেমনি কাজ করাতো। বেচারী পুলিশ বাহিনী যদি এদের কথা মতো কাজ না করতো—তাদের হয় চাকুরি যেতো, নয় জীবন। চাকুরি না হলেও চলবে না, প্রাণও বাঁচাতে হবে, কাজেই পুলিশমহল এদের ইংগিতে নাচতো—আমি সে নাচ বন্ধ করে দিবো।

সর্দার চোরাচালানীই সব কি শায়েস্তা হবে এদের বন্ধ করে? বললো রামসিং।

না, যারা ছোট খাটো এরা তো আছেই। আর এদের শায়েস্তা করতে আমার প্রয়োজন হবে না। মূল স্তম্ভ যারা, যারা এক দু' বা চার মণ নয় কোটি কোটি মণ খাদ্যশস্য এবং পণ্যদ্রব্য সীমান্তের বাইরে পাচারের জন্য নিয়োজিত ছিলো, আমি তাদের আটক করেছি। জীবনে মারবো না এদের। একটু থামলো বনহুর, তারপর বললো ক্ষুধার্ত জনগণের কষ্ট কিছুটা আঁচ করে নিক। বুঝুক ওরা যাদের ঘরে খাবার থাকেনা তাঁদের অবস্থা কেমন হয়। প্রতিদিন একখানা করে শুকনো রুটি দেবে আর দেবে এক কাপ করে পানি। যেন বন্দী খানায় কারো মৃত্যু না ঘটে।

বনহুর আস্তানার বাইরে বেরিয়ে আসে। অদূরে তাজ ও দুলকি অপেক্ষা করছিলো। তাজের পিঠে চেপে বসে বনহুর। আর রহমান চেপে বসে দুলকির পিঠে।

❑

দিপালী এখন সম্পূর্ণ সুস্থ, সে আবার আগের মত উচ্ছল চঞ্চল হাস্যদীপ্ত হয়ে উঠেছে। বনহুরের আস্তানায় সে এখন নিশ্চুপ থাকে না। সমস্ত আস্তানা সে চষে ফেরে।

মোহসিনের সঙ্গেই অবশ্য দিপালী বনহুরের আস্তানা ঘুরে ফিরে দেখেছে। সব দেখে সে অবাক হয়ে গেছে, এমন জায়গা সে কোনোদিন দেখেনি, তার বাবা হিম্মৎখাঁর আড্ডাখানা সে দেখেছে। কান্তাবারের অভ্যন্তরে ছিলো সে এক মহা ব্যাপার। কিন্তু এমন এক বিশাল রাজ্য দিপালী দেখেননি। একেবারে স্তম্ভিত হতবাক হয়ে গেছে সে।

দিপালীর কোথাও যেতে মানা নেই, তাই সে সময় অসময়ে আস্তানার সবকিছু ঘুরেফিরে দেখে।

সেদিন আস্তানা ছেড়ে সবাই কাজে গেছে। এমন সময় দিপালী ধীরে ধীরে অগ্রসর হলো আস্তানার দক্ষিণ দিকে। মোহসিন সব দিক দেখিয়েছে কিন্তু দক্ষিণ দিক সে তাকে দেখায় নাই।

দিপালী কিছুটা এগুতেই সে শুনতে পেলো একটা শব্দ ঘর্ ঘর্ ঘর্। এ কিসের শব্দ—ভাবলো দিপালী এবং অতি সতর্কতার সঙ্গে এগুলো। বেশ কিছুটা এগুতেই দেখলো উঁচু এক প্রাচীর। শব্দটা ঐ প্রাচীরের ভিতর থেকেই আসছে। দিপালী প্রাচীরের অপারের শব্দটার আসল রূপ দেখার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠলো।

একটা উঁচু স্থানে দাঁড়িয়ে সে প্রাচীরের উপারে উঠে পড়ার চেষ্টা করছে, এমন সময় দিপালীর কাঁধে কে যেন হাত রাখলো।

চমকে ফিরে তাকালো দিপালী।

সঙ্গে সঙ্গে দীপ্ত হয়ে উঠলো তার চোখ দুটি।

আনন্দ উচ্ছল কণ্ঠে বললো রাজকুমার!

হুঁ রাজকুমার নয়—দস্যু বনহুর।

না তুমি চিরদিন আমার কাছে রাজকুমার হয়েই থাকবে। বলো রাজকুমার, এতদিন তুমি কোথায় ছিলে?

বললো বনহুর—এই তোমার পাশে পাশেই ছিলাম দিপালী।

মিথ্যে কথা।

মোটেই মিথ্যে নয়, যাক বলো এদিকে কেন এসেছো?

এই শব্দটা আমাকে টেনে এনেছে। বলো রাজকুমার প্রাচীরের ওপাশে কিসের ও শব্দ?

তুমি জানতে চাও?

হাঁ, বড় ইচ্ছা হচ্ছে।

দিপালীর সব ইচ্ছাই সব সময় পূর্ণ হয় না। প্রাচীরের ওপাশে ও কিসের শব্দ তুমি জানতে পারবে না।

কেনো?

কেনো তাও বলা যাবে না।

রাজকুমার আজও তুমি আমাকে বিশ্বাস করো না। একটি বার নয় কয়েকবার তুমি আমার জীবন রক্ষা করেছো। আমি আজও তোমার এতোটুকু উপকার করতে পারিনি।

হাঁ, কিন্তু যখন প্রয়োজন হবে তখন করবে এবং করবে বলেই আমিও তোমাকে সেই শয়তানদের কবল থেকে উদ্ধার করে এনেছি। দিপালী একদিনেই তুমি আমাদের আস্তানার একজন হয়ে গেছো। এখন আমাদের আস্তানার বাইরে তুমি গেলেও আমাদের কোনো ক্ষতি সাধিত হবে না এ আমি জানি।

রাজকুমার তুমি বিশ্বাস করো আমার দ্বারা কোনোদিন তোমাদের কোনো ক্ষতি হবে না।

এ বিশ্বাস আমার আছে। দিপালী দেশ এখন মহা সমস্যার সম্মুখীন। দেশের প্রতিটি নাগরিককে সংগ্রাম করতে হবে, এ মহা সমস্যার করাল গ্রাস থেকে দেশকে মুক্ত করার জন্য।

বনহুরের কথাগুলো দিপালী সমস্ত মন দিয়ে শুনছিলো।

বনহুর বলে যাচ্ছে তখনও।

প্রাচীরের ও পাশ থেকে ভেসে আসছে এক টানা ঘর্ ঘর্ ঘর্ শব্দ......নিস্তব্ধ পুরিতে যেন এক অদ্ভুত পরিবেশ সৃষ্টি হচ্ছিলো। বনহুরের মুখমণ্ডলে গাম্ভীর্যের ছাপ বিদ্যমান সে বলছে এই মহা সমস্যা হতে দেশকে রক্ষা করতে হলে চাই অসীম মনোবল। চাই স্বার্থহীন সংগ্রাম। দিপালী শুধু কান্দাই শহরে নয়, সমস্ত দেশ ব্যাপি একটা বিরাট অশান্তির আগুন জ্বলছে। যে আগুনের জ্বালা আজ প্রতিটি মানুষের ঘরে ঘরে।

আমি জানি রাজকুমার তুমি যা বলতে চাও, আমি জানি। তুমি যা বলবে আমি তাই করবো। রাজকুমার বলো প্রাচীরের ওপাশে এ কিসের শব্দ?

তুমি জানতে চাও।

হাঁ।

বেশ এসো আমার সঙ্গে। বনহুর দিপালী সহ এগিয়ে যায় প্রাচীরের মাঝামাঝি এক অংশে। সম্মুখে কিছুটা এগিয়ে থমকে দাঁড়ায় বনহুর।

দিপালীও দাঁড়িয়ে পড়তে বাধ্য হয়।

বনহুর দেয়ালের এক অংশে চাপ দিতেই ধীরে ধীরে দেয়াল সরে যায় এক পাশে, বেরিয়ে আসে একটা পথ।

বনহুর দিপালীকে লক্ষ্য করে বলে চলো।

দিপালী বনহুরের অগ্রে প্রবেশ করে প্রাচীরের ভিতরে। বনহুর পিছনে এগিয়ে যায়।

ও পাশে একটি আধো অন্ধকার সুড়ঙ্গ পথ।

দিপালী হোচট খেয়ে পড়ে গেলো।

সঙ্গে সঙ্গে দিপালীকে ধরে ফেললো বনহুর। দিপালীর সমস্ত দেহ এবং মনে অপূর্ব এক শিহরণ নাড়া দিয়ে গেলো। দিপালীর হৃদয় অনাবিল এক আনন্দে আত্মহারা হলো।

বনহুর তাকে কোনোদিন স্পর্শ করেনি। আজ তাই দিপালী যেন অভিভূত হয়ে পড়লো। একটুখানি স্পর্শ একটু খানি ছোয়া তার শিরায় জাগিয়ে তুললো গভীর আবেগভরা একটা অনুভূতি।

বনহুর বললো অন্ধকার কিনা।

হাঁ, আলো থেকে হঠাৎ অন্ধকারে ঠিক দেখতে পারিনি রাজকুমার।

দিপালী তুমি এখনও আমাকে রাজকুমার বলবে?

এ ছাড়া তোমাকে কি বলে ডাকবো বলো?

বনহুর, মনির, বা সর্দার যা তোমার খুশি।

না ওসব নামে তোমায় মানায় না। তুমি আমার জীবনে এসেছো রাজকুমার বেশে। আমার রাজকুমার তুমি......

বনহুর কোনো জবাব দেয়না।

এগুতে থাকে ওরা।

কিছুটা এগিয়ে একটি লৌহ প্রাচীর। বনহুর সেই লৌহ প্রাচীরের সম্মুখে দাঁড়িয়ে একটি সুইচে চাপ দেয়, সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে পড়ে একটি ক্ষুদ্রাবৃত ছিদ্র পথ।

বনহুর বললো—সম্মুখে দৃষ্টি নিক্ষেপ করো দিপালী।

দিপালী ব্যাকুল আগ্রহে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলো। সঙ্গে সঙ্গে বিস্ময়ে আড়ষ্ট হলো সে। ওপাশে বিশাল এক রাজ্য বিরাট বিরাট মেশিন চলছে। ভাল ভাবে নজর পড়তেই দিপালী বলে উঠে অস্ত্রাগার। এখানে অস্ত্র তৈরি হচ্ছে?

হাঁ দিপালী, অস্ত্রাগারই বটে। এখানে যে কোনো আধুনিক অস্ত্র তৈরি হয়। এ স্থান কোথায় জানো?

না তো?

কান্দাই শহরের ভেনিয়ার হাজার ফিট মাটির নিচে আমরা এখন দাঁড়িয়ে। এই অস্ত্রাগার তৈরি করতে আমাদের কয়েক কোটি টাকা ব্যয় করতে হয়েছে। দীর্ঘ তিন বৎসর ধরে চব্বিশ হাজার দশ ইঞ্জিনিয়ার অবিরত কাজ করে, আমার এই অস্ত্রাগার তৈরি হয়েছে। দিপালী আমি জানি আমার অস্ত্রাগারে যে অস্ত্র তৈরি হচ্ছে তা পৃথিবীর কোনো অস্ত্রাগারে আজও তৈরি হয়নি। শব্দ বিহীন রিভলবার, রাইফেল, মেশিনগান এবং বোমা। যা বিস্ফোরণের শব্দ দশ হাতের মধ্যের কোনো ব্যক্তি শুনতে পারবে না। এ ছাড়াও আছে ভারী ভারী অস্ত্র......

আচ্ছা রাজকুমার এতো অস্ত্র তৈরি করে কি করবে তুমি?

ভয় নেই, যুদ্ধ আমি করবো না, কিন্তু দেশরক্ষার প্রয়োজনে যদি অস্ত্র প্রয়োজন হয় তখন আমার এই অস্ত্রাগার থেকে প্রয়োজনীয় অস্ত্র আমি দেশবাসীকে দেবো।

বনহুর যখন কথা বলছিলো তখন তার দিকে নির্বাক দৃষ্টি মেলে তাকিয়েছিলো দিপালী।

বনহুর বললো—অস্ত্রাগারের পাশে বেশিক্ষণ অপেক্ষা করা ঠিক্ হবেনা, চলো দিপালী একটা অদ্ভুত এবং বিস্ময়কর জিনিষ তোমাকে দেখাবো।

দিপালী বললো—চলো।

বনহুর আর দিপালী এগিয়ে চললো।

বেরিয়ে এলো তারা অস্ত্রাগারের পাশ থেকে। সুদীর্ঘ সুড়ঙ্গ পথ।

আধো অন্ধকারাচ্ছন্ন সুড়ঙ্গ পথে ওরা দু'জনা। দিপালীকে পথ দেখিয়ে নিয়ে চলেছে স্বয়ং দস্যু বনহুর।

কয়েক গজ এগিয়ে থমকে দাঁড়ালো বনহুর।

একটা ছোট্ট লিফ্‌ট।

উঠে দাঁড়ালো বনহুর বললো—এসো......

দিপালী উঠতে পারছিলোনা।

বনহুর হাত বাড়িয়ে দিলো, হাত ধরে উঠে এসো।

দিপালী বনহুরের বলিষ্ঠ হাতের উপর হাত রাখলো। বনহুর ওকে তুলে নিলো লিফ্‌টে পাশাপাশি দাঁড়ালো ওরা।

বনহুরের দেহের স্পর্শ দিপালীর দেহে শিহরণে জাগালো। অনন্তকাল ধরে যদি সে এমনি করে তার রাজকুমারকে পাশে পেতো। পৃথিবীর কোনো ঐশ্বর্যই সে চায়না-যদি সে ওকে পায় কিন্তু তাকে সে কোন দিন পাবে না, পেতে পারেনা কারণ সে অপবিত্রা। কিন্তু সে কি নিজে নিজের এই নষ্ট জীবনের জন্য দায়ী? দিপালী বনহুরের পাশে দাঁড়িয়ে ভাবছে। লিফ্‌ট সমানে এগিয়ে যাচ্ছে দিপালী বুঝতে পারছে না লিফ্‌ট উপরে উঠছে না নীচে নামছে। আসলে লিফ্‌ট চলেছে সোজাসুজি পাতালে।

দিপালীর মনে এক উচ্ছল আনন্দ, বনহুরকে সে কামনা করে কিন্তু কোনোদিন তাকে সে পাবে কিনা জানে না। এতো কাছে, তবু মনে হয় কত দূরের মানুষ সে।

লিফ্‌ট চলেছে।

দিপালীর মনে রাশি রাশি চিন্তাধারা বয়ে চলেছে।

দু'পাশে জমাট পাথুরে দেয়াল।

অন্ধকার কিছু হালকা বলে মনে হলেও খুব বেশি নয়।

তবে বনহুরকে দিপালী স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে। ওর নিঃশ্বাসের শব্দ শুনতে পাচ্ছে, এমনকি বনহুরের দেহের একটা পবিত্র উষ্ণতার ছোঁয়াচ তার দেহ স্পষ্ট করছে।

দিপালী ভাবছে একটিবার যদি সে রাজকুমারের বুকে মাথা রাখতে পারতো। যদি সে ঐ দুটি বলিষ্ঠ বাহুবন্ধনে আবদ্ধ হতে পারতো। কিন্তু না না এ চিন্তা করাও পাপ কারণ যে অপবিত্রা। রাজকুমারকে সে স্পর্শ করতে পারেনা।

বনহুর আর দিপালী নীরবে চলেছে।

উভয়ের মনের চিন্তাধারা এক নয়, দু'জন ভাবছে দু'দিক। বনহুর ভাবছে হয়তো তার কান্দাই জঙ্গলের আস্তানার কথা। ভাবছে তার কাজের কথা। ভাবছে জম্বুর ঘটনাগুলো নিয়ে আর দিপালী ভাবছে রাজকুমার কি কোনো দিন তার হবে না।

হঠাৎ দিপালীর চিন্তাধারা এলোমেলো হয়ে গেলো। বিরাটভাবে চমকে উঠলো দিপালী।

একটা তীব্র আর্ত চিৎকার অতি দুর্বল সে কণ্ঠস্বর অতি মর্মবিদারক করুন।

দিপালী বললো—রাজকুমার?

আশ্চর্য হচ্ছো দিপালী?

হাঁ। ও কিসের শব্দ?

তোমার কি মনে হয় দিপালী?

কোন মানুষের কণ্ঠস্বর।

না, মানুষের নয়।

বলো কি রাজকুমার আমি তো ঠিক মানুষের কণ্ঠস্বর শুনতে পেলাম।

বলেছি তো মানুষ নয়।

তবে কি?

জানোয়ার।

হাঁ।

কিন্তু মানুষের মত উচ্চারণ......

বেশ দেখলেই বুঝতে পারবে।

আমাকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছো রাজকুমার?

মনে কোনো সন্দেহ জাগছে?

না।

এমন নির্জন, নির্জনতার মধ্যেও তোমার মনে সন্দেহ জাগছে না দিপালী?

রাজকুমার যুগ যুগ তোমার পাশে থেকে এমনি করে চলতে পারলে নিজেকে সার্থক মনে করবো। রাজকুমার তুমি মানুষ নও দেবতা.........

দিপালী তুমি আমাকে ভালবাসো বলেই দেবতা মনে করো কিন্তু আসলে দেবতার মধ্যে যে গুণ থাকা দরকার তার একটি গুণও নেই আমার মধ্যে। এই তো আমরা প্রায় এসে গেছি। দিপালী সাবধান এবার যে জায়গা দিয়ে লিফ্‌ট চলতে শুরু করেছে অতি ভয়ঙ্কর জায়গা নিচের দিকে তাকিও না।

দিপালী হঠাৎ নিচে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে। সঙ্গে সঙ্গে ওর মাথা ঘুরে পড়ে যাবার উপক্রম হতেই ধরে ফেলে বনহুর।

দিপালী যেন অনাবিল এক আনন্দ সাগরে ডুবে যায়। যদিও দিপালী নিচে দৃষ্টি নিক্ষেপ করতেই সে দেখতে পেয়েছিলো গভীর একটি খাদ। সেই খাদ পেরিয়ে লিফ্‌ট এগিয়ে যাচ্ছে। দিপালীর মনে হচ্ছিলো যদি লিফ্‌ট খানা ছিঁড়ে তারা পড়ে যায় তা হলে আর রক্ষা থাকবে না। তাদের হাড়-গোড়

পিষে একাকার হয়ে যাবে। মাথাটা হঠাৎ কেমন যেন ঝিম ঝিম করে উঠেছিলো। বনহুর ওকে নিবিড়ভাবে কাছে টেনে নেবার সঙ্গে সঙ্গেই দিপালীর মনে হয়েছিলো এবার সে হাজার ফুট নিচে কেনো লক্ষ লক্ষ ফুট নিচে গভীর খাদের মধ্যে পড়ে মিশে যেতে পারে। দিপালীর মন প্রাণ আবেশে উচ্ছল হয়ে উঠেছিলো। কিন্তু সে নীরব ছিলো নিষ্প্রাণ পুতুলের মত এ মুহূর্তে তার মনে কোনো ভয় ছিলো, না বরং ছিলো অভূতপূর্ব এক শিহরণ।

বললো বনহুর—দিপালী ভয় নেই, আর একবার তাকিয়ে দেখো—

দিপালী তাকালো চোখ মেলে।

নিচে এখন আর গভীর খাদ নেই। লিফ্‌ট এসে থেমে পড়েছে।

বনহুর দিপালীর হাত ধরে নামিয়ে নিলো নিচে এ যেন যাদুর রাজ্য।

দিপালী মুগ্ধ চোখে তাকিয়ে দেখছে।

সম্মুখে বিরাট একটা জল কল্লোল হুহু করে বয়ে চলেছে দু'পাশে শ্বেত পাথরের আসন। জলধারা ছোট বড় পাথরের নুড়িগুলোর উপর দিয়ে কল কল ধরায় বয়ে যাচ্ছে।

অপূর্ব সে দৃশ্য।

যদিও ভূগর্ভ, তাতে কোনো সন্দেহ নাই তবু কোথা থেকে রাশি রাশি আলোক ছটা ছড়িয়ে পড়ছে জল কল্লোলের বুকে।

বনহুর এসে দাঁড়ালো।

দিপালী ওর পাশে। হঠাৎ দিপালী জলকল্লোলের ওপারে তাকিয়ে বিস্মৃত হলো, সুন্দর একটি কক্ষ। কক্ষটি ধপ ধপে মার্বেল পাথরে তৈরি। কক্ষটির দরজা বন্ধ। কক্ষ থেকে একটি সোপান নেমে এসেছে জল কল্লোলের বুকে।

কয়েকটি ধাপ জলকল্লোলের মধ্যে ডুবে রয়েছে। পাথরগুলোর বুকে আছাড় খেয়ে খেয়ে উচ্ছল জল রাশি নেমে যাচ্ছে নিচের দিকে।

দিপালী বললো—সত্যি বড় সুন্দর।

কি?

ঐ জল কল্লোল। আচ্ছা রাজকুমার ঐ জলকল্লোলের ওপাশে যে সাদা ধপ ধপে কক্ষটি দেখতে পাচ্ছি ওটা কিসের কক্ষ?

তোমার বুঝি দেখতে খুব ইচ্ছা হচ্ছে?

হাঁ।

চলো।

বনহুর আর দিপালী এগিয়ে যায় পাথরের ধাপে ধাপে পা রেখে। বনহুর অবশ্য ওকে মাঝে মাঝে এগুতে সাহায্য করছিলো।

আনন্দে দিপালীর মন উচ্ছল চঞ্চল হয়ে উঠে।

বলে দিপালী—রাজকুমার।

বলো?

সত্যি, আমি তো স্বপ্ন দেখছিনা।

স্বপ্ন?

হাঁ, এ যেন কোনো এক স্বপ্নময় রাজ্য বলে মনে হচ্ছে।

কেন?

আমি বিশ্বাস করতে পারছিনা, তুমি আছো আমার পাশে। এ যেন আমার কত সাধনার দিনগুলো খুঁজে পেয়েছি.........

দিপালী।

বলো রাজকুমার?

এত সাধ এত বাসনা তোমার মনে? আচ্ছা দিপালী এই সুন্দর স্বপ্নপুরি যদি আমি তোমাকে উপহারস্বরূপ দেই, বলো গ্রহণ করবে?

এত সুখ কি আমার সইবে রাজকুমার?

কেন? দিপালী, কেন তুমি ভয় পাও?

জানি না, কেন আমি ভয় পাই। জানিনা, আমি নিজেও। বড় দুঃখী, বড় অসহায়। আমি কিনা.........

দিপালী নিজেকে কোনো সময় এত ক্ষুদ্র বলে ভাবতে নেই। তুমি মানুষ এ কথা ভুলে যেও না।

কিন্তু.........

না, কোনো কিন্তু নেই। দিপালী তুমি থাকবে এই স্বপ্ন পুরিতে। যা চাইবে তাই পাবে, শুধু প্রয়োজন হলে কাজ করতে হবে। দিপালী বলো পারবে আমার কাজ করতে?

যা বলবে আমি তাই করবো?

সত্যি বলছো তো?

দিপালী কোনোদিন মিথ্যা বলে না।

জানি। তোমার উপর বিশ্বাস আসে।

কি কাজ করতে হবে বলো রাজকুমার?

অন্যায় কাজ আমি তোমায় করতে বলবোনা দিপালী, এ বিশ্বাস তুমি রেখো। তবে আজ কাজের কথা নয়।

তবে আনন্দের কথা বলো? আজকের এই পবিত্রময় মুহূর্তে আমি তোমার মুখে শুনতে চাই অনন্তকালের কাহিনী। যে কাহিনী কোনোদিন শেষ হবে না। রাজকুমার তুমিও যাবেনা আমার পাশ থেকে।

দিপালী আজ অবশ্য সময় হবে না, এরপর যেদিন আবার দেখা হবে, সেদিন তুমি যা জানতে চাইবে তাই আমি তোমাকে বলবো। এসো ঐ কক্ষটি তোমায় দেখাবো।

কি আছে ঐ কক্ষে।

ঐ কক্ষে তুমি থাকবে, যদি তোমার ভাল লাগে।

কিন্তু........

বুঝেছি একা ভয় পাচ্ছো। থাকতে পারবে না একা, তাই না? এসো দেখবে এসো......বনহুর দিপালীর হাত ধরে নিয়ে চলে সোজা।

জলচ্ছ্বাস পেরিয়ে পৌঁছে যায় ওরা কক্ষটির সম্মুখে।

শ্বেত পাথরে তৈরি একটি সমাধি মন্দিরের মত সুন্দর একটি কক্ষ। সুন্দর মসৃণ সোপানগুলো। অপূর্ব যেন একটি পথের খণ্ড।

বনহুর দরজার পাশে হাত রাখতেই খুলে যায় কক্ষটির দরজা।

আশ্চর্য এক দৃশ্য।

দিপালীর দু'চোখে বিস্ময় ঝরে পড়ে।

বনহুর বলে উঠে—দিপালী।

এত মনিমুক্তা, এত ধন সম্পদ......

তুমি যেমন অবাক হয়েছো, তেমনি বিস্মিত হয়েছে আমার স্ত্রী মনিরা, তবে এমন শ্বেত পাথরে তৈরি কক্ষ দেখে নয়। সে এক পোড়ো বাড়ির

অভ্যন্তরের নিভৃত এক কক্ষ......রাজকুমার তোমার স্ত্রী...তোমার স্ত্রী আছে?

হাঁ দিপালী......

কিন্তু......

কোনো কিন্তু নয়, আমার স্ত্রী আছে সন্তান আছে।

আমি বিশ্বাস করিনা।

কেন?

তুমি কোনোদিন বলোনি।

প্রয়োজন বোধ করিনি।

রাজকুমার।

দিপালী তুমি বিশ্বাস করো আর নাই করো আমি তোমাকে সত্য কথা বলবো কারণ তোমাকে আমার......প্রয়োজন......

তুমি.........

না না ছেড়ে দাও, ছেড়ে দাও। রাজকুমার আমি, আমি অপবিত্র এক নারী দেহ......

দিপালী তবু তোমাকে আমার প্রয়োজন! না হলে এতো দূর তোমায় নিয়ে আসতাম না......

দিপালী স্থির দৃষ্টি মেলে তাকায় বনহুরের মুখের দিকে। সে চাহনী নির্বাক অসহায় করুন নয়, এক বিস্ময়করভাবমূর্তি যেন কারণ সে এমন রূপ কোনোদিন রাজকুমারের মধ্যে লক্ষ্য করেনি। আজ এক নতুন রূপে সে দেখলো তাকে।

বললো বনহুর—দিপালী কি চাও তুমি বলো? আমাকে না এই শ্বেত স্বর্ণগুহার রত্ন সম্ভারগুলোও। যা চাও তাই পাবে।

না না আমি তোমাকে—তোমাকে চাই না। আমি স্বর্ণগুহার রত্নসম্ভারগুলোও চাই না......

দিপালী।

বলো রাজকুমার।

তবে কি চাও তুমি? বনহুর দিপালীর দেহখানা বলিষ্ঠ হাতের মুঠোয় চেপে ধরে ঝাঁকুনি দেয়।

বনহুরের নতুন রূপ দিপালীকে আরও বিস্মিত করলো শুধু বিস্মিত নয় একেবারে আশ্চর্য হয়ে গেছে সে, কত দিন কত নির্জনতা পূর্ণ পরিবেশেও কোনোদিন দিপালী তাকে অধৈর্য হতে দেখেনি বা ঘটেনি তার কোনো ধৈর্যচ্যুতি।

দিপালীকে ঝাঁকুনি দিয়ে বললো বনহুর—চুপ করে রইলে কেন, বলো।

না আমি কিছু চাই না।

শ্বেত কক্ষের রত্ন সম্ভার চাও না দিপালী?

না।

দিপালী এ তুমি কি বলছো?

চাইনা। চাইনা আমি কোনো কিছু।

আমাকে?

তোমাকে......তোমাকে আমি ভালবাসি রাজকুমার কিন্তু তোমাকে স্পর্শ করার মত সাহস আমার নেই......আমি যে অপবিত্র......

যে রাজ কুমারকে পাবার জন্য উন্মুখ দিপালী, যে রাজকুমারের সান্নিধ্য লাভের কামনা তাকে উন্মাদ করে তোলে এই মুহূর্তে সেই রাজকুমারের বাহু বন্ধনে আবদ্ধ হতে পারে সে ইচ্ছা করলেই কিন্তু সে নিজকে অতিকষ্টে সংযত করে নিলো।

বনহুরকে দিপালী সরিয়ে ছিলো।

দিপালীর চিবুক তুলে ধরলো বনহুর—একি তোমার চোখে পানি?

ও কিছু না।

বনহুর কি যেন ভাবলো, তারপর বললো—চলো ফিরে যাই।

চলো রাজকুমার তাই চলো। আমি চাই না তোমার রত্নসম্ভার।

দিপালী তুমি অপূর্ব! অপূর্ব তোমার মন। বড় সুন্দর তুমি......

না আমি যে কলঙ্কিনী......

তোমার জীবনের জন্য তুমি দায়ী নও।

জানি, তবু আমি......তবু পারিনা নিজের সম্বন্ধে কিছু ভাবতে। রাজকুমার বলো কেন, কেন আমি পারিনা নিজকে নিয়ে কোনো চিন্তা করতে।

হয়তো তোমার মনের ভ্রম......

না।

দিপালী তোমার জীবনের জন্য তুমি নিজে দায়ী নও। তোমাকে হরণ করা হয়েছিলো, তুমি তখন নিজেও জানতে না বা বুঝতে না কিছু।

দিপালীর দু'চোখে বিস্ময় ফুটে উঠে।

বনহুর বলে—এসো।

কোথায়?

ঐ জল কল্লোলের পাশে।

তোমার স্বর্ণগুহা বা শ্বেত কক্ষ এমনি খোয়া পড়ে থাকবে?

ক্ষতি হবে না, কারণ এ রাজ্যে কেউ কোনো দিন প্রবেশে সক্ষম নয়! এসো দিপালী......

চলো।

দিপালী আর বনহুর এসে বসলো জল কল্লোলের পাশে।

একরাশ আলোর ছটা এসে গড়িয়ে পড়েছে রূপালী জলস্রোতের উপর, ভারী সুন্দর লাগছে।

বনহুর বললো—দিপালী বুঝতে পারিনা মাঝে মাঝে কেন তুমি নিজের উপর অবিচার করো? তোমার জীবনে যা ঘটেছে সব তোমার অনিচ্ছায়, তবু কেন......

চুপ করো রাজকুমার।

দিপালী তোমার জীবনের জন্য তুমি দায়ী নও, দায়ী সেই শয়তান হিম্মৎ খাঁ। তোমাকে তোমার বাবা মার কাছ থেকে চুরি করে নিয়ে এসেছিলো শয়তানটা।

জানি, এ কথা তুমিই একদিন বলেছিলে আমাকে।

সব তুমি এখনও শোননি, সব কথা আমিও জানিনা, তবে যতটুকু জানি তা এই যে হিম্মৎ খাঁ তোমার অবুঝ অবস্থায় তোমাকে নিয়ে এসেছিলো কান্দাই শহরে। ছোট বেলায় মা বাবার কাছ থেকে তোমাকে ছিনিয়ে এনে শয়তানটা তোমাকে নিজের মেয়ে বানিয়ে নিয়েছিলো কিন্তু আসলেই কি তুমি তার নিজের মেয়ে হতে পেরেছিলে? পারোনি, কারণ হিম্মৎ খাঁ তোমাকে নিজের মেয়ের মত নিঃস্বার্থভাবে গ্রহণ করতে পারেনি। যদি সে

তোমাকে নিঃস্বার্থ ভাবে মেয়ে বানিয়ে নিতে পারতো তা হলে আজ তোমার উপর এমন একটা কলঙ্কের বোঝা চাপাতে পারতো না।

দিপালী বনহুরের কথাগুলো মনোযোগ সহকারে শুনে যাচ্ছিলো। এর পূর্বে একবার বনহুর দিপালীকে তার জীবন কাহিনী বলার চেষ্টা করেছিলো কিন্তু দিপালী সব শোনেনি বা শোনার সুযোগ লাভে সক্ষম হয়নি।

আজ দিপালী একান্তভাবে শুনে যাচ্ছে ওর কথাগুলো।

বনহুর কিছুটা বলে থেমে পড়লো।

দিপালীর দু'চোখে রাজ্যের বিস্ময় সে এবার প্রশ্ন করে বসলো তুমি যা বলছো সব কি সত্য?

হাঁ সত্যি। তবে প্রথমেই বলেছি তোমার জীবন কাহিনী যতটুকু জানি তা হিম্মৎ খাঁর কাছ থেকেই শোনা। কান্তাবারের এক নিভৃত কক্ষে বসে একদিন সে তার কন্যা দিপালীর জীবন কাহিনী কিছুটা বলেছিলো। জানো দিপালী সেদিন সে মাতাল ছিলো না বা নেশাও করেনি সে কিছু......

তবু বলেছিলো? কেন বলেছিলো?

হয়তো উদ্দেশ্য ছিলো । দিপালী হিম্মৎ খাঁ সেদিন চেয়েছিলো রাজ কুমার জ্যোতির্ময়কে নিজের আয়ত্বে আনতে।

হাঁ, এবার বুঝেছি, বুঝেছি সব কিছু।

দিপালী সব কিছু বলবার পূর্বেই সে সরে পড়েছিলো সেখান থেকে কারণ কোনো একটি মহান ব্যক্তির আর্বিভাব ঘটেছিলো সেদিন সেখানে!

রাজকুমার তোমার যা বলবার বলা শেষ হয়েছে?

হাঁ, দিপালী আজ আর নয়।

চলো তবে ফিরে যাই।

যাবে?

বনহুর ও দিপালী উঠে দাঁড়ালো। পুনরায় ওরা দু'জনা ফিরে এলো সেই লিফটের পাশে।

বনহুর লিফটে দাঁড়িয়ে ডাকলো এসো।

দিপালীর দিকে হাত বাড়ালো বনহুর।

দিপালীও হাত বাড়িয়ে দিলো।

লিফটে ওরা পাশাপাশি উঠে দাঁড়ালো। যতদূর সম্ভব দ্রুত লিফ্টখানা এগুচ্ছে। দু'পাশে পাথুরে দেয়াল। কেমন যেন আধো অন্ধকার স্বপ্নময় এক রাজ্য থেকে জমাট অন্ধকারের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে লিফ্টখানা।

বললো বনহুর—দিপালী হঠাৎ নীরব হয়ে গেলো কেন?

বলবার কিছু নেই তাই।

দিপালী তুমি কি ফিরে যেতে চাও তোমার সেই হারিয়ে যাওয়া বাবা মার কাছে? বলো—যদি যেতো চাও......

পারবে? পারবে রাজকুমার আমাকে তুমি নিয়ে যেতে আমার হারিয়ে যাওয়া বাবা মার কাছে? আমার ব্যর্থ জীবনটাকে নতুন আস্বাদে ভরিয়ে দিতে পারবে?

সাধ হয় যেতে?

হাঁ।

আমি তোমাকে তোমার বাবা মার কাছে ফিরিয়ে নিয়ে যাবো দিপালী।

সত্যি?

হাঁ সত্যি।

কিন্তু......

বলো থামলে কেন?

বাবা মা, যাদের কাছ থেকে আমি আজ বিশ বছর আগে হারিয়ে গেছি, কি করে তারা আমায় চিনবে বা আমি তাদের চিনে নেব বলো?

দিপালী তুমি যদি যাবার জন্য প্রস্তুত হয়ে নাও তা হলে কিছু ভাবতে হবে না তোমাকে। তোমার বাবা মাকে চিনে নেবার দায়িত্ব ভার আমার।

রাজকুমার পারবে আমার হারানো বাবা মা কে খুঁজে বের করতে?

পারবো? তুমি প্রস্তুত থেকো দিপালী, একদিন সময় এলেই আমি তোমাকে নিয়ে রওয়ানা দেবো তোমার দেশের উদ্দেশ্যে। দিপালী সত্যি বলতে কি, শুধু তোমার নয় তোমার মত শত শত অসহায় মেয়েদের জন্য বড় দুঃখ হয়। শয়তান হিম্মৎ খাঁর মত মানুষ নাকি জানোয়ারগুলো কত মেয়েকে বাবা মার সান্নিধ্য থেকে ছিনিয়ে এনে তাদের জীবন নিয়ে ছিনি মিনি খেলেছে।

হাঁ, রাজকুমার আমার মত কত মেয়ে আজ রিক্ত সর্বহারা.........বাষ্প রুদ্ধ হয়ে আসে দিপালীর কণ্ঠস্বর।

লিফ্‌ট এগিয়ে যাচ্ছে।

হঠাৎ সেই করুণ আর্তচিৎকার কিন্তু বড় ক্ষীণ দুর্বল।

দিপালী চমকে উঠলো।

বনহুর বললো—জানায়ারটা দেখছি এখনও বেঁচে আছে।

রাজকুমার কে সে জানোয়ার আমাকে বলবে কি?

সত্যি তুমি জানতে চাও।

হাঁ। যে জানোয়ার মানুষের মত কথা বলতে পারে আমি তাকে এক নজর দেখতে চাই।

বেশ আমি তোমায় নিয়ে যাচ্ছি।

বনহুর লিফ্‌টের উপরে এক স্থানে পা দিয়ে চাপ দিতেই লিফ্‌ট থেমে যায়। এবার লিফ্‌টখানা নামতে থাকে নিচের দিকে। কয়েক গজ নিচে নামার পর হঠাৎ থেমে যায় লিফ্‌টখানা।

দিপালী সম্মুখে তাকিয়ে দেখতে পায় একটা লম্বা টানা বারেন্দায় এসে থেমে গেছে লিফ্‌টখানা।

বনহুর বললো—নেমে এসো দিপালী।

দিপালী দু'চোখে বিস্ময় নিয়ে নেমে আসে লিফ্‌ট থেকে, লম্বা টানা বারান্দার মত প্রশস্ত বেলকুনি।

বনহুর দীপ্ত পদক্ষেপে এগিয়ে যাচ্ছে।

দিপালী তাকে অনুসরণ করে চলেছে। ভূগর্ভে এমন এক রাজ্য রয়েছে এ যেন তার কল্পনার বাইরে।

টানা বেলকুনি ধরে এগিয়ে যেতে যেতে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছিল দিপালী। যত দেখছে ততই যেন বিস্ময়ে হতবাক হয়ে যাচ্ছে সে। কি ভাবে এই রহস্যময় রাজ্য তৈরি হয়েছে কে জানে।

বনহুর মাঝে মাঝে দিপালীর দিকে তাকিয়ে দেখছিলো, দিপালীর মনোভাব সে বুঝতে পারে। বলে বনহুর—খুব অবাক হচ্ছো না?

সত্যি রাজকুমার কেমন করে মাটির নিচে এমন সুন্দর রাজ্য তুমি গড়েছো।

অবাক হবার কথাই বটে। একদিন আমি নিজেও তোমার মত অবাক হয়ে গিয়েছিলাম। সে আজ বেশ কয়েক বছর আগের কথা যখন প্রথম আমি এখানে আসি—আমার বাবা সর্দার কালু খাঁর সঙ্গে।

কালু খাঁ।

হাঁ, আমার বাবার নাম সর্দার কালু খাঁ।

কালু খাঁ তিনি কে এবং কি ছিলো?

দস্যু? দস্যু কালু খাঁ.........

দস্যু?

হাঁ।

বুঝেছি, তাই তুমিও তোমার বাবার মত দস্যু হয়েছো রাজকুমার।

বাবার মত দস্যু হতে পেরেছি কিনা জানিনা তবে সর্দার কালু খাঁর বাসনা আমি পূর্ণ করা শপথ নিয়েছি। মৃত্যুকালে সে আমাকে বলে গিয়েছিলো—বনহুর আমাকে স্পর্শ করে শপথ কর আমার যে ইচ্ছা নিয়ে বিদায় নিচ্ছি সে ইচ্ছা তুই পূর্ণ করবি বাপ? আমি বাবার মৃত্যু মূহূর্তের কথা ফেলতে পারলাম না, বাবার দেহ স্পর্শ করে বললাম—বলো বাপু তুমি কি ইচ্ছা নিয়ে আজ বিদায় নিচ্ছো? সর্দার কালু খাঁর চোখে আমি কোনদিন অশ্রু দেখিনি, আমার কথায় তার চোখ দুটো ছল ছল করে উঠলো। আমার হাতখানা মুঠায় চেপে ধরে বলল—বনহুর, আমার সাধনা ছিলো ধনবানের ঐশ্বর্য লুটে নিয়ে দেশের দুঃস্থ মানুষদের মধ্যে বিলিয়ে দিয়ে তাদের মুখে হাসি ফুটাবো কিন্তু সে সাধ আমার পূর্ণ হলো না.......বাপ তুই আমার সে সাধ পূর্ণ করার.........আমি স্পর্শ করে বলেছিলাম, করবো......দিপালী তাই করে চলেছি। তুমি যা দেখছো এই যে ভূগর্ভে বিশাল এক রাজ্য এ আমার নয় সেই মহান মহৎ আমার শিক্ষা গুরু দস্যু কালু খাঁর অক্লান্ত পরিশ্রমের স্মৃতি সৌধ।

থামলো বনহুর কারণ তার কণ্ঠ ধরে এসেছিলো চাপা কান্নায়। রুমালে চোখ মুছলো সে।

দিপালীর চোখে বিস্ময়, দস্যু বনহুরের চোখে পানি দেখে সে অবাক হয়ে গেলো।

বনহুর নিজেকে স্বাভাবিক করে নিল মুহূর্তে, তারপর এগুতে লাগলো সম্মুখে। এখন সেই ক্ষীণ আর্তনাদ আরও স্পষ্ট শোনা যাচ্ছে।

দুর্বল কোনো মানুষের কণ্ঠস্বর।

যত এগুচ্ছে ততবেশি অবাক হচ্ছে দিপালী, কারণ সে কণ্ঠস্বর সে শুনতে পাচ্ছে না মানুষের, কোনো জানোয়ারের নয়। রাজকুমার বলছে এ কণ্ঠস্বর মানুষের নয়, জানোয়ারের, দিপালীর মনে তাই বিস্ময় জাগছে।

একটি কক্ষের সম্মুখে এসে থামলো বনহুর। দেয়ালের এক স্থানে একটি সুইচের মত যন্ত্র রয়েছে সেই যন্ত্রে চাপ দিতেই কক্ষের দরজা খুলে গেলো।

বনহুরের পিছনে দাঁড়িয়েছিলো দিপালী, কক্ষ মধ্যে দৃষ্টি পড়তেই চমকে উঠলো সে ভীষণভাবে। দেখলো কক্ষ মধ্যে ঝল মল করছে রাশিকৃত মোহর এবং চাপ চাপ সোনা দানা। মাঝখানে একটি জীবন্ত কঙ্কাল দাঁড়িয়ে আছে, টলছে লোকটা।

দিপালী অস্ফুট কণ্ঠে বললো—কে এই মানুষ?

বনহুর হেসে বললো—কাকে তুমি মানুষ বলছো দিপালী মানুষ নয় জানোয়ার।